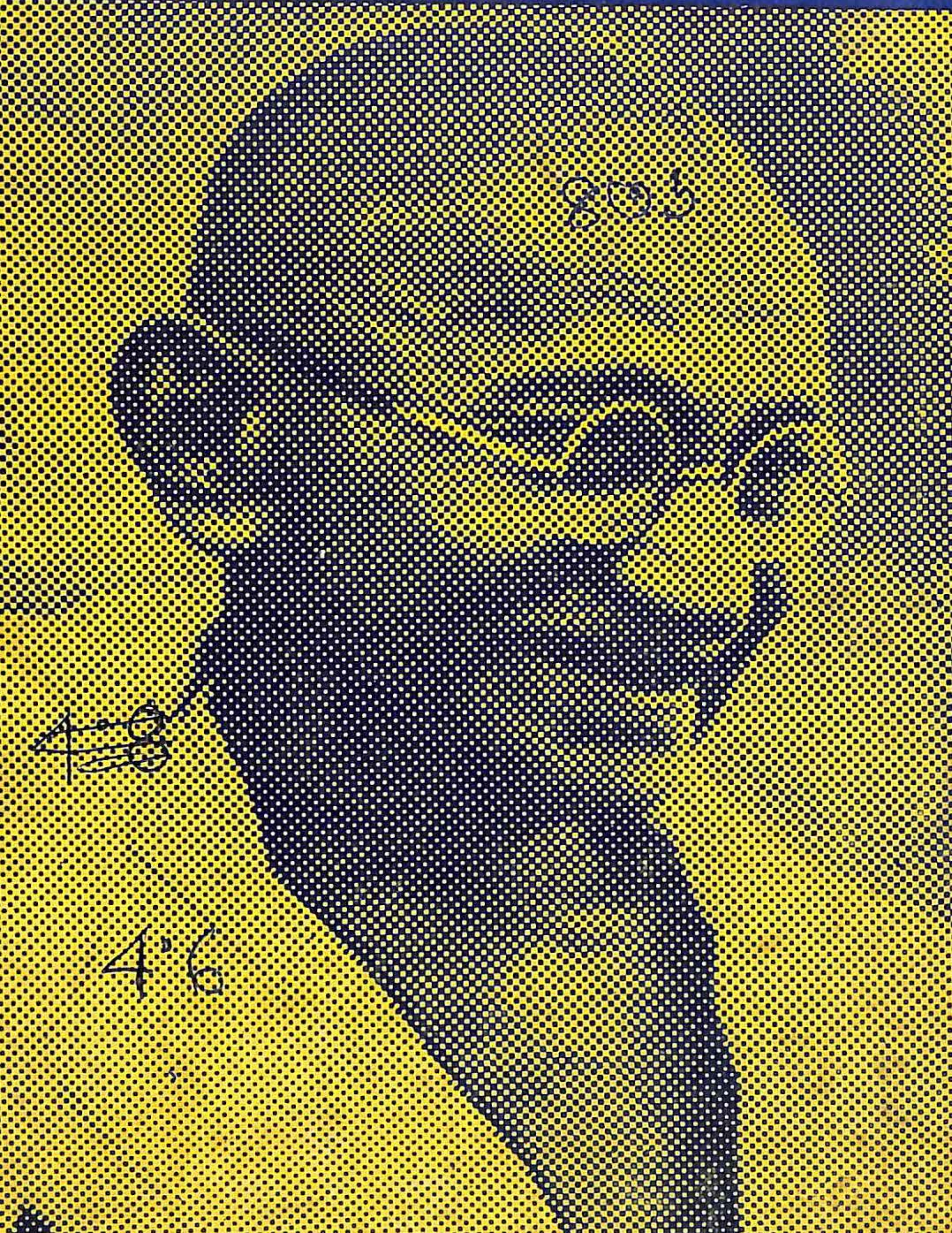
মহাত্মা গান্ধী

রোমাঁ রোলাঁ



মহাত্মা গান্ধী

রোমাঁ রোলাঁ

অনুবাদ

ঋষি দাস

ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানি
সি ২৯-৩১ কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা ৭০০ ০০৭

বঙ্গানুবাদ সংস্করণ : ১৯৪৮
দ্বিতীয় প্রকাশ : ১৯৫২
তৃতীয় প্রকাশ : ১৯৫৬
চতুর্থ প্রকাশ : ১৯৬৯
পঞ্চম প্রকাশ : ১৯৭০
ষষ্ঠ প্রকাশ : ১৯৮৪

দাম ১০·০০ টাকা

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস প্রাঃ লিঃ, ৫ চিন্তামনি দাস লেন, কলিকাতা-৯ হইতে শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায় কর্তৃক মুদ্রিত ও সি ২৯-৩১ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-৭ হইতে শ্রীপ্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক কর্তৃক প্রকাশিত

মুখপত্র

এই প্রবন্ধের প্রারম্ভে আমি আমার বন্ধু কালিদাস নাগকে সস্নেহ ধন্যবাদ জানাইতেছি। তাঁহার অগাধ জ্ঞান ও সতত সৌজন্য আমাকে হিন্দু-চিন্তার অরণ্যে পথ দেখাইয়া লইয়া গিয়াছে। তাঁহার মূল্যবান সকল সাহায্য সত্ত্বেও এই প্রবন্ধে যে সকল ভুল-ত্রুটি রহিয়া গেল, সেজন্য আমি তাঁহার নিকট মার্জনা ভিক্ষা করিতেছি। আমার মতে, এই প্রবন্ধটি আমার প্রথম প্রয়াস এবং ইউরোপীয় জনসাধারণের পক্ষে অপরিহার্য মোটামুটি ধরনের একটি খসড়া মাত্র। এই সঙ্গে আমি মাদ্রাজের প্রকাশক এস্. গণেশনকে-ও ধন্যবাদ জানাইতেছি। তিনি আমাকে তাঁহার প্রকাশিত বহু বিষয় ব্যবহারের সুযোগ দিয়া বাধিত করিয়াছেন।

র. র.

অনুবাদকের কথা

অহিংসা কথাটির সঙ্গে সভ্যতার ইতিহাসে পাঁচটি নাম সহজে মনে পড়ে। বুদ্ধ, খ্রীষ্ট, টলস্টয়, রোঁলা ও গান্ধী। পৃথিবীর একই যুগের একজন অহিংসার ঋষি কেমন ভাবে অপর একজন অহিংসার ঋষিকে দেখিয়াছেন, গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাই এই পুস্তকের লক্ষণীয় বিষয়। এই পুস্তকে দুইটি বিপুল 'আত্মার' কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে—রোঁলার ও গান্ধীর। অবশ্য ইহা রোঁলার সদা-চঞ্চল দিদৃক্ষু আত্মার পথ-পরিক্রমণের আংশিক ইতিহাস মাত্র। পরবর্তী কালে ইহার অনেক চিন্তাকেই তাঁহার সত্যকামী মন সন্দেহের সহিত পরিত্যাগ করিয়াছিল। যাহাই হউক, ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ইতিহাসে এই পুস্তকখানি যে অবিস্মরণীয় তাহা নিঃসন্দেহ।

হে গৌরব ও গোলামির দেশ,
হে অচির সাম্রাজ্যের দেশ,
হে মৃত্যুঞ্জয় মহিম চিন্তার দেশ,
হে কাল-স্পর্ধিত অযুত সন্তানের দেশ,
হে নবজাগ্রত ভারত,
তোমাকে

হে রবীন্দ্রনাথ! হে গান্ধী! ভারতের সিন্ধু গঙ্গা দু'টি নদী! পূর্ব ও পশ্চিমকে যুগল আলিঙ্গনে আবেষ্টন করিয়াছেন আপনারা! প্রথম জন, আপনি আলোকের স্বপ্ন; দ্বিতীয় জন, আপনি মহাত্মা, আপনি আত্মোৎসর্গ ও শৌর্যের প্রতিমূর্তি! আপনারা উভয়ে ভগবানের আত্মজ! আজ ঘৃণা ও বিদ্বেষের হলাঘাতে বিচ্ছিন্ন জর্জরিত এই পৃথিবী! ইহার বুকে আপনারা বিধাতার বীজ বপন করুন, বিক্ষিপ্ত করুন।

মার্চ, ১৯২৩

মহাত্মা গান্ধী

প্রথম অধ্যায়

ক্ষুদ্রকায় দুর্বল মানুষ, শীর্ণ মুখ, প্রশান্ত দুটি চোখ, বাহিরের দিকে প্রসারিত দুটি কান। মাথায় সাদা রঙের একটি পাগড়ি, পরনে মোটা সাদা রঙের একখানি থান, অনাবৃত দুটি পা। খাদ্য চাউল, ফল ও জল। ভূমিতে শয়ন, স্বল্পকাল মাত্র নিদ্রা; অক্লান্ত কাজ। তাঁহার দৈহিক প্রকাশ আদৌ গ্রাহ্য করিবার মতো নয়। তাঁহাকে প্রথমে দেখিলেই এক বিরাট ধৈর্য ও অসীম ভালোবাসার প্রতিমূর্তি বলিয়া মনে হয়। পিআর্সন যখন তাঁহাকে ১৯১৩ সালে দক্ষিণ আফ্রিকায় দেখেন, তখন ঋষি ফ্রান্সিস্ অব আসিসির কথা তাঁহার মনে পড়িয়াছিল। পরম শত্রুর প্রতিও তাঁহার অগাধ স্নেহ, অপার সৌজন্য! অসীম তাঁহার দীনতা। সদা সচেতন, চঞ্চল, 'আমি ভুল করিয়াছি' এ-কথা স্বীকার করিতে যেন তিনি সর্বদা প্রস্তুত। তিনি কদাপি তাঁহার ভুল গোপন করেন না; কখনো আপোষের মধ্যে আসেন না, কখনো কূটনীতির আশ্রয় লন না, কখনো বক্তৃতায় মাত করিতে চান না—বরঞ্চ বক্তৃতার কথা তিনি ভাবেনও না। তাঁহার ব্যক্তিত্ব যে স্তুতি ও সম্বর্ধনার জন্য জনসাধারণকে স্বতঃই ব্যাকুল ও ব্যগ্র করে, তাহাও তিনি পছন্দ করেন না। অনেক সময় এই সম্বর্ধনার ভীড়ে তাঁহার ক্ষুদ্র শীর্ণ দেহখানি নিষ্পেষিত দলিত হইবার সম্ভাবনাও ঘটে। তখন তাঁহার বন্ধু মওলানা শওকত আলি নিজের বিপুল সবল দেহের আশ্রয়পুটে তাঁহাকে সকল বিপদের হাত হইতে সযত্নে রক্ষা করেন। এই মহাপুরুষ, মহাত্মা, জনসাধারণের স্তুতি-তোষণে একেবারে তিতি-বিরক্ত হইয়া পড়েন। অন্তরে অন্তরে গণ-শব্দে তাঁহার অবিরল অবিশ্বাস, গণশাসন বা বিশৃঙ্খল জনতার প্রতি তাঁহার পরম ঘৃণা। মাত্র কতিপয়ের সান্নিধ্যেই তিনি স্বস্তি এবং সহজ ভাব অনুভব করেন। নির্জন নৈঃশব্দ্যে থাকিতে তিনি ভালোবাসেন, কারণ তখন তিনি বিধাতার নীরব নির্মল বাণী শুনিতে পান!...

ইনি সেই মানুষ, যিনি ত্রিশ কোটি মানুষকে কর্মপ্রেরণায় জাগাইয়া তুলিয়াছেন, সারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে কম্পমান করিয়া দিয়াছেন, যিনি মানুষের রাজনীতির মধ্যে প্রবর্তন করিয়াছেন প্রায় দুই হাজার বৎসরের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শক্তিমান এক নীতির আন্দোলন, আদর্শ।

এঁর পুরা নাম মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। ইনি উত্তর-পশ্চিম ভারতের একটি ক্ষুদ্র অর্ধ-স্বাধীন রাজ্যে ১৮৬৯-এর ২রা অক্টোবর তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। এঁর

পিতা করমচাঁদ গান্ধী এই রাজ্যের প্রধান সচিব ছিলেন। ইনি ধনী, বুদ্ধিমান এবং সংস্কৃতি-সম্পন্ন বংশে জন্মগ্রহণ করেন, কিন্তু উচ্চ ব্রাহ্মণশ্রেণীতে জন্মেন নাই। এঁর পিতামাতা উভয়েই হিন্দুধর্মের জৈন সম্প্রদায়ের অন্তর্গত ছিলেন। এই জৈনদের ধর্মের মূল সূত্র অহিংসাকে ইনি পরবর্তীকালে সগৌরবে সারা বিশ্বে প্রচার করিয়াছেন। জৈনদের মতে, বোধির অপেক্ষা প্রেম-ই মানুষকে পরমপুরুষের সান্নিধ্য-গোচর করে। গান্ধী-পরিবারে নিয়মিত ভাবে রামায়ণ পাঠ হইত। গান্ধীজীর বাল্য-শিক্ষা নিয়োজিত ছিল এক ব্রাহ্মণের হস্তে। এই ব্রাহ্মণ তাঁহাকে বিষ্ণুশর্মার রচনা পড়াইতেন। পরবর্তীকালে গান্ধীজী অনুযোগ করেন, তিনি সংস্কৃত সাহিত্যে সুপণ্ডিত হইতে পারেন নাই। ইংরেজি ভাষা তাঁহাকে তাঁহার মাতৃভাষার সম্পদ হইতে বঞ্চিত করিয়াছে বলিয়া তিনি তাঁহার ইংরেজি-ভাষা-বিরোধিতার স্বপক্ষে যুক্তিও দেখান। যাহাই হউক, হিন্দুশাস্ত্রে তাঁহার প্রচুর অধিকার জন্মে, তবে তিনি বেদ ও উপনিষদগুলি কেবলমাত্র অনুবাদেই পাঠ করেন।

বাল্যাবস্থাতেই তাঁহার বিবাহ হয়। কুড়ি বৎসর বয়সে তিনি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং ইন্‌স্‌ অব কোর্টে তাঁহার শিক্ষা সমাপ্ত করিতে যান। তাঁহার মা অত্যন্ত ধর্মভীরু ছিলেন। তিনি বিলাত যাইবার পূর্বে পুত্রকে জৈনধর্ম অনুসারে তিনটি শপথ গ্রহণ করিতে বাধ্য করেন—মদ্য, মাংস ও নারীর বর্জন। আমরা তাঁহার আলোচনার একটিতে (১৩ই এপ্রিল, ১৯২১) লক্ষ্য করি যে, তিনি ইউরোপে অবস্থানকালে অন্যান্য বহু ধর্ম সম্বন্ধেও পড়াশুনা করেন এবং এই পড়াশুনার ফলে এক সময় তিনি খ্রীষ্টানধর্ম ও হিন্দুধর্মের মধ্যে দুলিতে থাকেন। অবশ্য পরে তিনি বুঝিতে পারেন যে, 'কেবলমাত্র হিন্দুধর্মের মধ্য দিয়াই তাঁহার পক্ষে সুখী হওয়া সম্ভব।' তিনি ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে ফিরিয়া আসেন এবং বোম্বাইএর হাইকোর্টে অ্যাড্‌ভোকেট হন। কিন্তু কয়েক বৎসর বাদে তিনি এই পেশাকে দুর্নীতিপরায়ণ ভাবিয়া পরিত্যাগ করেন। এমন কি যে কয় দিন তিনি এ্যাড্‌ভোকেটের কাজ করেন, তখনও তিনি কোনো মামলার মধ্যে অন্যায়ের আভাস পাইলেই তাহা তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করিতেন।

এই সময়ে, বড় বড় রাজনীতিক নেতাদের ক্রিয়াকলাপে তিনি নিজের মধ্যে তাঁহার ভাবী জীবনের মহান্‌ উদ্দেশ্য সম্পর্কে অস্পষ্ট সংকেত পান। এই নেতাদের মধ্যে যাঁহারা তাঁহার জীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করেন, তাঁহারা হইলেন বোম্বাইএর মুকুটহীন রাজা পার্শি দাদাভাই এবং অধ্যাপক গোখলে। ইঁহারা উভয়েই এক ধর্মমিশ্রিত দেশপ্রেমের উদ্দীপনায় মাতিয়া উঠিয়াছিলেন। গোখলে তাঁহার দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজনীতিক; ভারতীয় শিক্ষার সমস্যাকে যাঁহারা জীয়াইয়া তুলিয়াছিলেন, তিনিও তাঁহাদের অন্যতম। এবং দাদাভাই (গান্ধীজীর নিজের প্রমাণপ্রয়োগ অনুসারে) যিনি ভারতীয় জাতীয়তাবাদের প্রবর্তক, তিনিই গান্ধীজীর তারুণ্য-চঞ্চল উত্তেজনাকে বল্গা-রুদ্ধ করিয়া গান্ধীজীকে তাঁহার রাজনীতিক জীবনে অহিংসাকে কার্যত ব্যবহারের প্রথম পাঠ দেন। তিনিই শেখান

নিষ্ক্রিয় শৌর্য, আত্মার প্রাণোন্মাদনা, যাহা অমঙ্গলের প্রতিরোধ করে,—অমঙ্গলের দ্বারা নয়, প্রেমের দ্বারা। এই প্রবন্ধের অন্যত্র আমরা এই জাদুকরের মন্ত্র 'প্রেম'-এর মধ্যে ফিরিয়া আসিব—যে প্রেম শব্দটি ভারতের প্রশান্ত গম্ভীর বাণী বহন করিয়া আজ বিশ্বের তোরণে উপস্থিত হইয়াছে।

গান্ধীজীর যখন রাজনীতিক জীবন আরম্ভ হয়, তখন ১৮৯৩ সাল। ১৮৯৩ সাল হইতে ১৯১৪ সাল পর্যন্ত তাঁহার অক্লান্ত কর্মের স্থান ছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের পর তাঁহার কর্মস্থল খাস ভারতেই চলিয়া আসে।

দক্ষিণ আফ্রিকায় বিশ বৎসর ধরিয়া গান্ধীজীর অক্লান্ত পরিশ্রম সত্ত্বেও ইউরোপে যে তাহার কোনো প্রতিধ্বনি বা প্রতিঘাত ঘটে নাই, ইহা হইতে কেবল মাত্র বোঝা যায় আমাদের রাজনীতিকদের, আমাদের ঐতিহাসিকদের, আমাদের চিন্তাশীল ব্যক্তিদের, এমন কি, আমাদের ধর্মযাজকদের অবিশ্বাস্য সংকীর্ণতা। কারণ, এই বিশ বৎসর ছিল একটি আত্মার যুগ—আমাদের কালে যাহার কোনো তুলনা নাই। ইহার জন্যে যে বিরাট শক্তি ও অটল আত্মত্যাগের প্রয়োজন ঘটিয়াছিল, কেবল তাহাই অতুলনীয় নহে, এই সংগ্রামে যে চূড়ান্ত জয়লাভ ঘটিয়াছিল, তাহাও অতুলনীয়।

১৮৯০-১৮৯১ এর মধ্যে দেড় লক্ষ ভারতবাসী দক্ষিণ আফ্রিকায়, বিশেষ করিয়া নাটালে বসবাস করিয়াছিলেন। এই বিদেশী জনস্রোতের আগমনের ফলে এখানের সাদা অধিবাসীদের মধ্যে কালাদের প্রতি ঘৃণার মনোভাবের উদ্রেক হয় এবং এই ঘৃণাকে সরকার নির্বাসন ও নির্যাতনের কাজে লাগান। ভারতবাসীদের দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রবেশ নিষিদ্ধ হয়, এবং যাঁহারা ইতিপূর্বেই এখানে বসবাস করিয়াছিলেন সরকার তাঁহাদের বহিষ্কারের সংকল্প করেন। এইরূপে নিয়মিত নির্যাতনের ফলে তাঁহাদের জীবন দুঃসহ হইয়া উঠে। দুর্বহ ট্যাক্স, পুলিশের অসম্মানকর আইনকানুন, প্রকাশ্যে দলে দলে উৎপীড়ন, লিন্‌চিং, লুটপাট, বলাৎকার প্রভৃতি ব্যাপারগুলি শ্বেত সভ্যতার আবরণে চলিতে থাকে। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়রা গান্ধীজীর নিকট সাহায্য ভিক্ষা করেন। ফলে গান্ধীজী সেখানে সত্বর ছুটিয়া আসেন।

তারপর রাষ্ট্রের ও হিংস্র জনসাধারণের বর্বর শক্তির বিরুদ্ধে সুরু হয় বিবেকের যুগান্তকারী এক সংগ্রাম। তখনো উকিল থাকায় আইনের পথেই তিনি এশিয়াটিক বিতাড়ন বিলের আইনবিরুদ্ধতার দিকটি দেখাইলেন এবং ভয়াবহ বিরোধিতা সত্ত্বেও জিতিয়া গেলেন। অতঃপর তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রবাসী স্বদেশবাসীদের জন্যে নাগরিকের সম্মানজনক অধিকার লাভ এবং সেই অধিকার রক্ষার উদ্দেশ্যে সাধারণ দক্ষিণ আফ্রিকাস্থ ভারতীয়ের জীবন বরণ করিতে মনস্থ করিলেন। তিনি ঋষি ফ্রান্সিস অব আসিসির মতো দারিদ্র্যকে বরণ করিবার জন্যই পরিত্যাগ করিলেন জোহানেস্‌বার্গে তাঁহার প্রসারের প্র্যাক্‌টিশ। তিনি নিপীড়িত নির্যাতিত ভারতীয়দের সকল দুঃখে ও দারিদ্র্যে অংশ গ্রহণ করিতে লাগিলেন এবং তাঁহাদিগকে শিখাইতে লাগিলেন 'নির্বিরোধিতার' মন্ত্র। তিনি টলস্টয়ের একান্ত

নেতৃত্বে কাজ করিতে থাকেন। জি. কে. গোখলের দেশপ্রেমে গলদ ছিল না, কিন্তু ইংরেজদের সম্পর্কে তাঁহার বিশ্বস্ততা ছিল অটুট। তখন জাতি-দর্পের একটি মনোভাব এই জাতীয় প্রতিনিধিদের সংগঠনটিকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল। তাহারই ফলে এই সংগঠন 'স্বরাজ'-এর দাবি করিয়া বসিলেন। অবশ্য, তখনো এই 'স্বরাজ' শব্দটির অর্থ সম্পর্কে সকল নেতা একমত ছিলেন না। একদল স্পষ্টত ইংরেজদের সহিত সহযোগিতা চালাইবার সপক্ষে ছিলেন। অপর দল বৃটিশের সহিত সকল সম্পর্ক হইতেই ভারতকে মুক্ত দেখিতে চাহিতেছিলেন। পূর্বোক্তগণ কানাডা ও দক্ষিণ আফ্রিকার আদর্শের অনুগামী ছিলেন, এবং পরোক্তগণ ছিলেন জাপানের অনুরূপ স্বাধীনতার পক্ষপাতী। গান্ধীজী এই অবস্থায় আসিয়া সমস্যার সমাধান করিয়া দিলেন। এই সমাধান রাজনৈতিক অপেক্ষা অধিক পরিমাণে ধর্মনৈতিক হইলেও অন্যান্য সকলের অপেক্ষা অধিক প্রগতিশীল ছিল। ইহাই 'হিন্দ্ স্বরাজ্য'। অবশ্য ঐ সময় দেশের পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্পর্কে গান্ধীজীর সম্যক জ্ঞানের অভাব ছিল—যে অভাবের ফলে তাঁহার মতামতগুলিকে কার্যত নিয়োগ করা বা অবস্থার অনুরূপে সংস্কার ছিল অসম্ভব। কারণ, আমাদিগের ভুলিলে চলিবে না যে গান্ধীজী হিন্দু আত্মার সম্বন্ধে অন্তরঙ্গ গভীর জ্ঞান এবং 'অহিংসার' দুর্বার শক্তির পূর্ণ অধিকারী হইলেও তিনি তাঁহার স্বদেশ হইতে দূরে ছিলেন দীর্ঘ তেইশ বৎসর। তাই দেশে ফিরিয়া তিনি পারিপার্শ্বিক সকল বিষয় লক্ষ্য করিতে লাগিলেন এবং সেই অনুসারে নিজের চিন্তা ও মতামতগুলিকে করিলেন সংস্কৃত এবং সংকলিত।

১৯১৪ খৃষ্টাব্দে ইউরোপে যখন মহাযুদ্ধের বিস্ফোরণ ঘটিল, তখন গান্ধীজী ইংরেজ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করার কথা চিন্তা করা দূরে থাকুক, তিনি নিজে একটি এ্যাম্বুলেন্স বাহিনী গঠনের জন্যে ইংল্যান্ড রওনা হইলেন। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে গান্ধীজী লেখেন যে "তিনি আন্তরিক ভাবে বিশ্বাস করেন তিনি বৃটিশ সাম্রাজ্যের একজন নাগরিক মাত্র।" ১৯২২ সালে লেখা চিঠিগুলিতে তিনি বহুবার এই উক্তির পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন। "ভারতের সমস্ত ইংরেজদের প্রতি" : "প্রিয় বন্ধুগণ! আমার ঊনত্রিশ বৎসরের রাজনীতিক জীবনে আমি নিজে বৃটিশ সাম্রাজ্যের সহিত যেরূপ নিবিড়ভাবে সহযোগিতা করিয়াছি, কোনো ইংরেজও বুঝি তেমনটি করেন নাই। আমি ইংল্যান্ডের জন্য চারিবার জীবন বিপন্ন করিয়াছি।......

১৯১৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত আমি সর্বান্তঃকরণে এবং দৃঢ়বিশ্বাসের সহিত কেবলমাত্র সহযোগের কথাই বলিয়া আসিয়াছি।......"

অবশ্য, এ ব্যাপারে তিনি নিঃসঙ্গ ছিলেন না। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে 'ন্যায়-যুদ্ধের ধাপ্পাবাজী আদর্শের মোহে সমগ্র ভারতও নিজেকে প্রতারিত করিয়াছিল। ইংল্যান্ড যখন যুদ্ধের জন্যে ভারতের কাছে সাহায্য চাহিল, তখন সে ভারতবাসীর চোখের সম্মুখে বহু আশা এবং অঙ্গীকার তুলিয়া ধরিয়াছিল। ভারতকে তাহার সাহায্যের ও বিশ্বস্ততার পুরস্কাররূপে বহু-প্রত্যাশিত স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দিতেও

ইংল্যান্ড প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে বিচক্ষণ ভারত-সচিব ই. এস. মণ্টেগু ভারতকে দায়িত্বশীল শাসন-অধিকার দিবার অংগীকার করেন। সরকারী ভাবে মতের আদান-প্রদানও চলিতে থাকে এবং ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে বড়লাট লর্ড চেমসফোর্ড গঠনতান্ত্রিক সংস্কার-সংক্রান্ত একটি রিপোর্টে মণ্টেগুর সহিত স্বাক্ষরও করেন। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের এই গোড়ার কয়েক মাসে মিত্রশক্তির পক্ষে বিপদও ছিল ভয়ানক। ২রা এপ্রিল তারিখে লয়েড জর্জ ভারতবাসীর নিকট এক আবেদন ঘোষণা করিলেন এবং ঐ মাসের শেষের দিকে দিল্লীতে যে যুদ্ধ-সম্মিলন হইল, তাহাতেও ভরসা দেওয়া হইল যে, ভারতের স্বাধীনতার দিন সমাগত। এই আহবানে সমগ্র ভারত সংঘবদ্ধভাবে সাড়া দিল এবং সাহায্য হিসাবে ইংল্যান্ডকে দিল তাহার নয় লক্ষ পঁচাশি হাজার মানুষ। কেবল তাহাই নহে, ভারতবর্ষ নিঃস্বার্থভাবে আরো প্রচুর স্বার্থ ত্যাগ করিল, যাহার পরিমাণ হয় না। এবং পরিপূর্ণ বিশ্বাসের সংগেই ভারত সেদিন প্রত্যাশা করিল এই বিশ্বস্ততার যথোপযুক্ত পুরস্কার মিলিবে।

কিন্তু তাহার এই স্বপ্ন একদিন ভয়ানকভাবে ভাঙিয়া গেল। ঐ বৎসরের শেষের দিকে যুদ্ধে পশ্চিম সীমান্তে মিত্রশক্তির বিপদের আশংকা কাটিয়া গেল। সেই সংগে ভারতের প্রদত্ত সাহায্য এবং সেবার কথাও ভুলিয়া গেল ইংরেজরা। সন্ধির কাজ শেষ হইলে গভর্নমেণ্ট তাহার মুখোস খুলিল। ভারতকে বিন্দুমাত্র স্বাধীনতা দেওয়া দূরে থাক, নাগরিকদিগের যে স্বাধীন অধিকারগুলি ছিল তাহাও সরকার একে একে ছিনাইয়া লইতে লাগিল। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে দিল্লীর সাম্রাজ্যবাদী আইনসভায় রাউলাট বিলগুলির উত্থাপন ঘটিল। যে-দেশ ইংল্যান্ডের প্রতি তাহার পূর্ণ বিশ্বস্ততার প্রমাণ নিঃসন্দেহে দিয়াছিল, তাহার প্রতি এই বিলগুলিতে ঘোষণা করা হইল হীন অবিশ্বাস। যুদ্ধের সময় যে-ভারতরক্ষা বিধি প্রচলিত ছিল, এই বিলগুলিতে তাহারই আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি করা হইল। গোয়েন্দা পুলিশের বিভাগটি ঘাঁটি গাড়িয়া বসিল। এবং সেন্সর প্রভৃতি "অবরুদ্ধ অবস্থার" সকল প্রকার জঘন্য ব্যাপারকেই করা হইল চিরস্থায়ী।

এইবার মোহমুক্ত ভারতে এক ঘৃণা এবং বিদ্বেষের মনোভাব জাগিয়া উঠিল। শুরু হইল বিপ্লব এবং গান্ধীজী হইলেন এই বিপ্লবের নেতা, নিয়ামক।

পূর্ববর্তী কয়েক বৎসর কৃষকদিগের অবস্থার উন্নয়ন প্রভৃতি সমাজ-সংস্কারের কাজে গান্ধীজীর মনোযোগ নিবদ্ধ ছিল। ইতিপূর্বে তিনি সাধারণভাবে গুজরাটের খেড়ায় এবং চম্পারণে অহিংসার অপরাজেয় মন্ত্রের পরীক্ষা চালান এবং সাফল্য লাভ করেন। এই অস্ত্রই তিনি পরবর্তীকালে বিপুল জাতীয় সংগ্রামে ব্যবহার করিয়াছেন—এই উদ্দীপনায় নির্বিরোধিতার অস্ত্র, যে-অস্ত্র বিশেষভাবে কেবল তাঁহারই। এ সম্বন্ধে আমরা 'সত্যাগ্রহ' সংক্রান্ত অংশে আলোচনা করিব। গান্ধীজী নিজেই অহিংসাকে সত্যাগ্রহ আখ্যা দিয়াছেন।

কিন্তু ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি ভারতীয় রাজনীতিক জীবনের কর্ম-চাঞ্চল্য হইতে একরকম দূরেই ছিলেন। এই রাজনীতিকগণের মধ্যে অপেক্ষাকৃত

প্রগতিশীল অংশটি ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে মিসেস এনী বেসাণ্টের চেষ্টায় পুনরায় সংঘবদ্ধ হন (যদিও ইঁহারা শীঘ্রই এনী বেসাণ্টকে ছাড়াইয়া যান) এবং লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলককে তাঁহাদের নেতা হিসাবে গ্রহণ করেন। লোকমান্যের ছিল অসামান্য প্রাণশক্তি এবং অসাধারণ মনোবল। তাঁহার মধ্যে বুদ্ধি-দৃপ্ততা, মনঃশীলতা এবং চরিত্র, এই ত্রয়ী প্রতিভার কঠিন সমন্বয় ঘটিয়াছিল। গান্ধীজীর অপেক্ষা তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তি ছিল প্রখরতর; প্রাচীন এশিয়ার ঐতিহ্যের এবং সংস্কৃতির বুকে তিনি গান্ধীজীর অপেক্ষাও অধিক পরিমাণে লালিত হইয়াছিলেন। তিনি ছিলেন ঋষিতুল্য সুপণ্ডিত। তিনি তাঁহার প্রতিভার সকল দাবিকেই জাতীয়তার সেবার বেদীমূলে উৎসর্গীকৃত করিয়াছিলেন। গান্ধীজীর মতোই কোনোপ্রকার ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষা তাঁহার ছিল না। তিনি আশা করিতেছিলেন, দেশের সংগ্রাম সাফল্য-মণ্ডিত হইলেই তিনি পুনরায় ব্যক্তিগত জীবনে ফিরিয়া আসিবেন এবং বিজ্ঞান বিষয়ে গবেষণা করিবেন। তিলক যতদিন বাঁচিয়া ছিলেন, ততদিন তিনিই ছিলেন দেশের অবিসম্বাদী নায়ক। যদি ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসের অকালমৃত্যু তাঁহাকে ছিনাইয়া না লইত, তবে কী ঘটিত কে বলিতে পারে? গান্ধীজী এই বিপুল প্রতিভার সম্মুখে শ্রদ্ধায় সম্ভ্রমে নিজেকে নত করিতেন। তবে, জাতীয় আন্দোলনের রাজনীতিক রীতি সম্পর্কে তিলকের সঙ্গে তাঁহার মতের ছিল মূলত প্রভেদ। তিলক যদি বাঁচিয়া থাকিতেন, এ বিষয় নিঃসন্দেহ ছিল যে গান্ধীজী জাতীয় আন্দোলনের ধর্মের দিকটি লইয়াই নিজেকে সাবধানে ব্যস্ত ব্যাপৃত রাখিতেন। দ্বিগুণিত নেতৃত্বের ফলে ভারতের জনসাধারণের শক্তি কী দুর্দমই না হইয়া উঠিত! কোনো শক্তিই তখন ভারতীয় জনগণের প্রতিরোধ করিতে বা তাহাদিগকে দমন করিতে সমর্থ হইত না। কারণ, তিলক ছিলেন কর্মের অধিকারী এবং গান্ধীজী আধ্যাত্মিক শক্তির। কিন্তু নিয়তির ইচ্ছা ছিল অন্যরূপ। তিলকের মৃত্যু আরো বেদনাদায়ক, কারণ, ইহা কেবল ভারতবর্ষকে আঘাত করিল না, গান্ধীজীরও ক্ষতি করিল। দেশের সংখ্যাল্পের, অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ নীতিবিদ্‌দের পুরোভাগে ছিলেন গান্ধীজী। এঁদের নেতৃত্ব করাই ছিল গান্ধীজীর স্বভাব এবং আশা-আকাঙ্ক্ষার অনুকূলে। সংখ্যাধিকদের নায়কত্ব করার ভার তিনি স্বেচ্ছায় তিলকের হাতে ছাড়িয়া দিতে পারিতেন। সংখ্যাধিকের উপর গান্ধীজীর নিজেরও কোনো বিশ্বাস ছিল না। কিন্তু তিলক ছিলেন কর্মে আংকিক, তাই সংখ্যার শক্তিতে ছিল তাঁহার গভীর বিশ্বাস। তিলকের জন্ম গণতন্ত্রে। কেবল তাহাই নয়, তিনি ছিলেন বদ্ধ রাজনীতিক, ধর্মের প্রয়োজন সম্পর্কে তিনি নিজেকে কখনো ব্যস্ত করেন নাই। তিনি প্রায়ই বলিতেন, "রাজনীতি সাধুদিগের জন্য নহে।" এই মহা-পণ্ডিত জাতীয় মুক্তির জন্য সত্যকে বলি দিতেও কুণ্ঠিত ছিলেন না। এই সত্যবাদী মানুষটি, যাঁহার ব্যক্তিগত জীবন ছিল শুভ্র, কলঙ্কহীন, তিনি রাজনীতিতে কোনো কিছু অন্যায় নহে, এ-কথা বলিতেও বিন্দুমাত্র দ্বিধা করিতেন না। একথা বলা যাইতে পারে যে, এই ধরনের লোক এবং মস্কোর একনায়কদের মধ্যে চিন্তার কোনো সাদৃশ্য বা সম্পর্ক থাকিতেও পারে। কিন্তু, অপর পক্ষে, গান্ধীজীর সহিত বলশেভিকবাদের সহিত কোথাও

কোনো সম্পর্ক নাই। তিলক ও গান্ধীর মধ্যে যে সমস্ত পারস্পরিক আলাপ-আলোচনা হইয়াছে, তাহা হইতেই স্পষ্টই বোঝা যায়, তাঁহাদের পরস্পরের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা থাকা সত্ত্বেও, তাঁহাদের রীতির মধ্যে ছিল পার্থক্য, বিরোধ। গান্ধীজী ঘোষণা করিয়াছিলেন, যদি প্রয়োজন হয়, দেশকে তিনি যতোই দেবতার মতো ভালোবাসুন না কেন, সত্যের জন্য স্বাধীনতাকে বিসর্জন দিতেও তিনি কুণ্ঠিত হইবেন না। কিন্তু তিলক এমনটি করেন নাই। গান্ধীজী তাঁহার ধর্মকে তাঁহার দেশের অপেক্ষা অনেক বেশী ভালোবাসেন।

"আমি ভারতের সহিত সম্পৃক্ত, কারণ আমার সকল কিছুই আমি তাহার নিকট হইতে পাইয়াছি। আমি সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করি যে, সারা পৃথিবীর জন্যে ভারতের নিজস্ব একটি শুভ উদ্দেশ্য রহিয়াছে। ভারত যদি তরবারির নীতি গ্রহণ করে, তবে ইহা আমার পক্ষে চরম পরীক্ষার কারণ হইবে। আমি আশা করি, তখনো আমি হীন হইব না। আমার ধর্ম ভূগোলের সীমা মানে না। আমি যদি এই ধর্মে অটুট বিশ্বাস রাখিতে পারি, তবে আমার এই ধর্মই একদিন আমার দেশপ্রীতি রূপে প্রতিভাত হইয়া উঠিবে।"[৪]

মহান্ এই কথাগুলি। আমরা যে-সংগ্রামের বর্ণনা করিব, এই কথাগুলিই তাহার স্বরূপের সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা দিবে। এই কথাগুলিই ভারতের ঋষিকে বিশ্বের ঋষিতে পরিণত করিয়াছে, তাঁহাকে পরিণত করিয়াছে আমাদিগের সহ-নাগরিকে।[৫] গত চারি বৎসর ধরিয়া ভারতে যে সংগ্রাম চলিতেছে, তাহা আমাদিগেরই হিতার্থে।

ইহা উল্লেখযোগ্য যে, এমন কি যখন গান্ধীজী রাউলাট আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন, তখনো তিনি তাহা করিয়াছিলেন কেবলমাত্র "হিংসার মধ্য হইতে আন্দোলনকে সরাইয়া আনিবার জন্য।"[৬] তিনি জানিতেন বিদ্রোহ আসিয়াছে, বিদ্রোহকে পথ দেখাইতে হইবে।

ভারতীয় রাজনীতির পরবর্তী বিকাশের ধারাকে ভালোভাবে বুঝিতে হইলে আমাদের স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, গান্ধীজীর দর্শন দুইটি বিভিন্ন পদার্থে গঠিত : ধর্ম-সংক্রান্ত তলাকার স্তর, ইহা যেমন দৃঢ়, তেমনি বিপুল; এবং "সামাজিক কর্ম", যাহা তিনি বাস্তবিক পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং দেশের জনমত অনুসারে এই সর্বব্যাপী ধর্মের ভিত্তির উপর গড়িয়া তুলিয়াছেন। তাঁহার প্রকৃতির দিক হইতে তিনি ঘোরতর ভাবে ধর্মপ্রবণ। তিনি রাজনীতিক, নিতান্ত দায়ে পড়িয়াই।

ঘটনাচক্রে এবং দেশের অন্যান্য নেতাদের অন্তর্ধানের ফলে যখন তাঁহাকে ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সমুদ্রে কর্ণধারের কঠিন দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইল, তখনই তাঁহার ক্রিয়াকাণ্ডের ব্যবহারিক দিকটা হইয়া উঠিল প্রবল ও স্পষ্ট। কিন্তু এই সৌধের

---

[৪] গান্ধীজী বলশেভিকবাদ সম্পর্কে স্পষ্টভাবে তাঁহার বিরুদ্ধ মত জানাইয়াছেন। ১১ই আগস্ট ১৯২০। ইয়ং ইণ্ডিয়া, পৃষ্ঠা ২৫৯।

[৫] "সমস্ত মানুষই এক। জাতির মধ্যে পার্থক্য থাকিতে পারে, কিন্তু যে জাতি যতো উচ্চ হইবে, তাহার কর্তব্যও হইবে ততো অধিক।"—এথিক্যাল রিলিজিয়ন।

[৬] ৫ই নভেম্বর, ১৯১৯।

মূল অংশটা হইল ভূগর্ভস্থ এক মন্দির, গভীর এবং বিশাল।

তাঁহার এই ভূগর্ভস্থ মন্দিরটির উপরেই আর একটি বিশাল মন্দির রচনার ইচ্ছা রহিয়াছে, এখন যেটি তাড়াতাড়ি তৈয়ার হইয়াছে, সেটি নয়, আর একটি। এই মূল অংশটি দীর্ঘস্থায়ী। ক্ষণস্থায়ী বাকী সবটুকুই; সেগুলি কেবল সংক্রান্তি কালের কয়েকটি বৎসরের উদ্দেশ্যেই তৈয়ারী। এই মাটির তলাকার মন্দিরের স্বরূপটি আমাদের স্পষ্টভাবে জানা দরকার, কারণ, এখান হইতেই গান্ধীজী তাঁহার দর্শনের সকল প্রেরণা লাভ করিয়া থাকেন। এখানেই এই ভূতলস্থ মন্দিরেই, গান্ধীজী প্রতিদিন আসেন বিশ্রামের জন্যে এবং সংগ্রহ করেন বাহিরের কাজের জন্যে নূতন শক্তি।

গান্ধীজী তাঁহার দেশের জনসাধারণের ধর্ম 'হিন্দুধর্মে'ই প্রবল বিশ্বাসী। কিন্তু তিনি পণ্ডিতদের সুলভ সাহিত্যিক কৌতূহল নিবারণের জন্য শাস্ত্রাদি যেমন পাঠ করেন না, তেমনি অন্ধ ভক্তের মতোও গ্রহণ করেন না হিন্দুধর্মের সকল প্রকার অনুষ্ঠান এবং ঐতিহ্যকে। তাঁহার ধর্মবিশ্বাসগুলি বিবেক এবং বুদ্ধির দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত।

"আমি যেমন ধর্মকে পুরাতন অচল পদার্থ বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না, তেমনি ধর্মের পবিত্র নামে প্রচলিত সকল প্রকার পাপকেও ন্যায্য বলিয়া মানি না।[৭] আমি যদি কোন ব্যক্তিকে যুক্তির দ্বারা বিশ্বাস করাইতে না পারি, তবে আমি তাহাকে আমার অনুসরণ করিতে বলিব না। শাস্ত্র যতোই প্রাচীন হউক না কেন, তাহা যদি আমার বুদ্ধির কাছে আবেদন না করে, তবে তাহার সকল স্বর্গীয়তা এবং পবিত্রতা আমি বিসর্জন দিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হইব না।"[৮] বিপরীত পক্ষে—এবং তাঁহার পক্ষে ইহা অত্যন্ত স্বাভাবিকও—তিনি হিন্দুধর্মের মধ্যে কোন বৈশিষ্ট্যই দেখিতে পান না এবং হিন্দুধর্মকে কোনো বৈশিষ্ট্য দিতেও চান না।

"আমি চতুর্বেদের বিশেষ কোনো প্রকার স্বর্গীয়তায় বিশ্বাস করি না। বাইবেল, কোরান এবং জেন্দ আভেস্তাকেও বেদের অনুরূপ দৈববাণী বলিয়াই বিশ্বাস করি। হিন্দুধর্ম ধর্মান্তরের ধর্ম নহে। এই ধর্মের মধ্যে পৃথিবীর সকল ধর্মের ঋষি এবং পয়গম্বরের পূজার অবকাশ আছে। হিন্দুধর্ম প্রত্যেককে স্ব স্ব বিশ্বাস বা ধর্ম অনুসারে ভগবানের স্তুতি করিতেই শিক্ষা দেয়। এমনিভাবেই এই ধর্ম সকল ধর্মের সহিত বিনা বিরোধেই বাঁচিয়া থাকে।"[৯]

বহু শতাব্দীর পথ ধরিয়া যে সমস্ত ভুল ও ত্রুটি হিন্দুধর্মের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়াছে, সে সম্বন্ধেও গান্ধীজী সচেতন। এই ভুল এবং ত্রুটিগুলির তিনি তীব্র নিন্দা করেন :

---

৭ ২৭শে অক্টোবর, ১৯২০।

৮ জুলাই, ইয়ং ইণ্ডিয়া, এবং ৬ই অক্টোবর ১৯২১।

৯ সকল ধর্মই হইল বিভিন্ন পথ, সেগুলি একই লক্ষ্যে গিয়া মিশিয়াছে। 'হিন্দ স্বরাজ্য' এবং "এথিক্যাল রিলিজিয়ন" দ্রষ্টব্য।

"আমার স্ত্রীর প্রতি আমি যেমনটি অনুভব করি, হিন্দুধর্মের প্রতিও আমি অনুভব করি তেমনটি। আমার স্ত্রী আমাকে যে ভাবে অভিভূত করেন, পৃথিবীর আর কোন নারীই তেমনটি পারেন না। তাঁহার কোনো দোষ-ত্রুটি যে নাই এমনও নহে। আমার বিশ্বাস, আমি নিজে তাঁহার যে সকল দোষ-ত্রুটি দেখিতে পাই না, এমন দোষ-ত্রুটিও হয়তো তাঁহার আছে। কিন্তু তথাপি আমি তাঁহার সহিত অচ্ছেদ্য এক বন্ধনের অস্তিত্ব অনুভব করি। হিন্দুধর্মের বেলাতেও ইহার সমস্ত ত্রুটি এবং সংকীর্ণতা সত্ত্বেও আমি এমনি একটি ভাব অনুভব করি। হিন্দুধর্মের যে দুটি পুস্তক আমি জানি বলিয়া বলা চলিতে পারে, সেই গীতা এবং তুলসীদাস-রচিত রামায়ণের সংগীত আমাকে এমন বিচলিত এবং পুলকিত করে যে, আর কিছুই তেমনটি করিতে পারে না। হিন্দুর মন্দিরে মন্দিরে যে আজ পাপ চলিতেছে তাহা জানি, এবং তাহা সত্ত্বেও আমি এই মন্দিরগুলিকে ভালোবাসি। হাড়ে হাড়ে আমি সংস্কারক। কিন্তু তথাপি সংস্কারের উৎসাহ আমাকে হিন্দুধর্মের মূল বস্তুগুলিকে বিসর্জন দিতে প্রলুব্ধ করিতে পারে না।"[১০]

তবে এই মূল সত্যগুলি কি, যেগুলির প্রতি গান্ধীজী তাঁহার আনুগত্যের কথা বলেন? ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই অক্টোবর তারিখে লিখিত একটি প্রবন্ধে এগুলিকে তিনি স্পষ্টভাবেই ব্যক্ত করিয়াছেন। এই প্রবন্ধটিকে 'পাবলিক ক্রেডো' এই নাম দেওয়া যাইতে পারে :

(১) আমি বেদে, উপনিষদে, পুরাণে এবং হিন্দুশাস্ত্রের নামে যাহা কিছু চলিতেছে, তাহার সবকিছুতেই বিশ্বাস করি। সুতরাং আমি 'অবতার' এবং পুনর্জন্মও মানি।

(২) আমি 'বর্ণাশ্রম ধর্মে' বিশ্বাস করি; আমার মতে যাহা খাঁটি বৈদিক বর্ণাশ্রম ধর্ম। কিন্তু আমি বর্তমানে প্রচলিত অমার্জিত তথাকথিত বর্ণাশ্রমে বিশ্বাস করি না।

(৩) আমি গো-সেবায় বিশ্বাসী—ইহার প্রচলিত অপেক্ষা প্রশস্ততর অর্থে-ই।

(৪) আমি মূর্তি-পূজায় অবিশ্বাস করি না।

প্রত্যেক ইউরোপীয়ান, যিনিই উপরোক্ত লাইনগুলি পড়িবেন, তিনিই সম্ভবত অনুভব করিবেন যে, এখানে যে মনোবৃত্তির প্রকাশ হইয়াছে, তাহা আমাদের অপেক্ষা এমন স্বতন্ত্র এবং স্থান ও কালের দূরত্বে এমন পৃথক একটি ধর্মের এবং সমাজের সূত্রের মধ্যে কঠিন করিয়া গ্রথিত যে, এই চিন্তার ধারা অনুসরণ করাও অনর্থক মাত্র। কিন্তু তিনি যদি আরো কয়েক লাইন পড়িয়া যান, তবে নিম্নলিখিত জিনিসগুলি পাইবেন, যেগুলির সহিত তিনি অপেক্ষাকৃত পরিচিত :

"হিন্দুধর্মে একটি প্রবচন আছে যে, যাঁহারা অহিংসায়, সত্যে এবং ব্রহ্মচর্যে পূর্ণ সার্থকতা লাভ করেন নাই এবং যাঁহারা সর্বস্ব ত্যাগ করেন নাই, তাঁহারা শাস্ত্রের বাস্তবিক কিছুই জানেন না। আমি এই প্রবচনটি অবাধে বিশ্বাস করি।"

---

১০ ৬ই অক্টোবর ১৯২১, ইয়ং ইন্ডিয়া, ৮০১ পৃষ্ঠা।

এখানে হিন্দুই চিন্তার সহিত বাইবেলের চিন্তার মিলন ঘটিয়াছে। এই সম্পর্কটি সম্বন্ধে গান্ধীজীও সম্পূর্ণরূপে সচেতন ছিলেন। কোনো ইংরেজ মিশনারী যখন তাঁহাকে প্রশ্ন করেন যে, কি কি বই তাঁহাকে সর্বাপেক্ষা অধিক প্রভাবিত করিয়াছে, তিনি সর্বপ্রথমই উচ্চারণ করেন, 'দি নিউ টেস্টামেণ্ট'।[১১] তাঁহার রচিত 'এথিক্যাল রিলিজিয়ন'-ও যিশুর বাণী উদ্ধৃত করিয়াই শেষ হইয়াছে।[১২] তাহা ছাড়া, ইউরোপীয়দের মনে রাখিতে হইবে যে এই এশিয়াবাসী বিশ্বাসী মানুষটি টলস্টয়ের শিক্ষায় পুষ্ট হইয়াছিলেন,[১৩] তিনি রাস্কিন ও প্লেটোর অনুবাদ করিয়াছিলেন।[১৪] তিনি থরো-এ বিশ্বাস করেন, ম্যাটসিনির প্রশংসা করেন, এডওয়ার্ড কার্পেণ্টারের রচনা পড়েন এবং তাঁহার সকল চিন্তাই আমেরিকা ও ইউরোপের শ্রেষ্ঠ দানের উপর ভিত্তি করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। কোন ইউরোপীয়ান যদি উপযুক্ত মনোভাব লইয়া অগ্রসর হন, তবে তিনি এই মহাপুরুষের চিন্তার সহিত নিজেকে অপরিচিত মনে করিবেন, এমন কথা ভাবিবার কোন কারণ নাই। গান্ধীজীর যে 'ক্রেডো' প্রবন্ধগুলি তাঁহাকে আপাতদৃষ্টিতে বিস্মিত করিয়া দিয়াছে মনে হইয়াছিল, সেগুলির গভীর তাৎপর্য তিনি বুঝিতে পারিবেন। বিশেষ করিয়া এই বিষয়গুলির দুইটি : গো-সেবা এবং জাতিভেদ-প্রথা আপাতদৃষ্টিতে ভারত ও ইউরোপের ধর্মভাবের মধ্যে এক দুস্তর ব্যবধান রচনা করিয়া দিয়াছে মনে হইবে। কিন্তু দেখাই যাক্, 'ক্রেডো'র এই দুইটি বিষয় বলিতে গান্ধীজী নিজে কি বুঝেন।

বাস্তবিক পক্ষে, গান্ধীজীর মতবাদের মধ্যে এই দুইটি বিষয় অপ্রধান বা অবহেলার যোগ্য নহে। গোরক্ষা হইল হিন্দুধর্মের বৈশিষ্ট্য। গান্ধীজী ইহার মধ্যে মানবিক উদ্‌বর্তনের উচ্চতম প্রকাশ লক্ষ্য করিয়াছেন। কেন? "অব-মানবিক জগতের সহিত মানুষ যে সৌহার্দ্যের সন্ধি করিয়াছে, এই গো-জাতিই হইল তাহার প্রতীক। এবং মানুষ ও পশুর মধ্যে যে সৌভ্রাত্র্য আছে তাহাই প্রকাশ করে এই প্রতীক।" গান্ধীজীর নিজের কথায়, "এই নীতিই মানুষকে তাহার স্বজাতীয়তার ঊর্ধ্বে লইয়া যায়। ইহাই তাহাকে সকল জীবিতের সঙ্গে একান্বিত করে।" অন্য জীবকে গ্রহণ না করিয়া গোরুকে কেন গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহার একমাত্র কারণ, ভারতবর্ষে গোরুই সর্বাপেক্ষা বড়ো সহচর, ইহাই প্রাচুর্যের উৎস এবং গান্ধীজী এই কোমল প্রাণীটির

---

[১১] গান্ধীজী নিউ টেস্টামেণ্টের পরেই রাস্কিন ও টলস্টয়ের নাম উচ্চারণ করেন।

[১২] ভগবানের সাম্রাজ্য এবং ন্যায়ের সন্ধান কর, তাহা হইলে বাকী সবটুকুও তুমি পাইবে।

[১৩] "হিন্দ স্বরাজ্য" পুস্তিকার শেষের দিকে গান্ধীজী টলস্টয়-রচিত ছয়খানি পুস্তকের তালিকা দিয়া সকলকে সেগুলি পড়িতে উপদেশ দিয়াছেন, বিশেষ করিয়া "ভগবানের সাম্রাজ্য তোমারই অন্তরে" এবং "আর্ট কি?" এই দুইখানি পুস্তক। "আপনার সহিত কাউণ্ট টলস্টয়ের সম্পর্ক কি," এই প্রশ্ন করা হইলে, গান্ধীজী তাঁহার "ইয়ং ইণ্ডিয়ায়" তাহার জবাবে বলেন, "টলস্টয়ের সহিত আমার সম্পর্ক ভক্তের সম্পর্ক। আমি আমার জীবনের অনেক কিছুর জন্যেই তাঁহার নিকট ঋণী।" এই সঙ্গে টলস্টয়ের "উদারনীতিকদের প্রতি পত্র"-ও দ্রষ্টব্য, "ইয়ং ইণ্ডিয়া" ২৫২ পৃষ্ঠা।

[১৪] ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে ভারত সরকার যে সমস্ত পুস্তক বাজেয়াপ্ত করেন, গান্ধীকৃত অনুবাদ "সক্রেতিশের বিচার এবং মৃত্যু"-ও তাহার অন্যতম।

মধ্যে দেখিয়াছেন "করুণার এক বিপুল কাব্য।" কিন্তু তাঁহার এই ধর্মানুষ্ঠানের মধ্যে বিগ্রহপূজার কিছুই নাই। ভগবানের সৃষ্ট জীবের প্রতি দয়াধর্ম না করিয়া যাহারা কেবল শাস্ত্রের আক্ষরিক অনুসরণ করে, গান্ধীজী তাহাদের নির্মম কুসংস্কারের যেরূপ নিন্দা তিরস্কার করেন, তেমনটি আর কেহ করেন নাই। একবার এই নীতির মূল সূত্রটুকু বুঝিলে (আসিসির সেই দরিদ্র অপেক্ষা আর কে ভালো বুঝিবে?) গান্ধীজী তাঁহার 'ক্রেডো'তে এই বিষয়টিকে এমন গুরুত্বপূর্ণ একটি স্থান কেন দেন, তাহা ভাবিয়া বিস্ময়ের কিছুই থাকিবে না। তিনি তাঁহার এই স্বকীয় বিশেষ অর্থে যখন বলেন যে, গোরক্ষার শিক্ষাই পৃথিবীর কাছে হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠ দান, তখন কোনো ভুল করেন না। 'প্রতিবেশীকে নিজের মতোই ভালোবাসিবে' বাইবেলের এই বাণীর সহিত তিনি যোগ করিয়াছেন, "প্রত্যেকটি জীবই তোমার প্রতিবেশী।"[১৫]

ইউরোপীয়ানদের পক্ষে জাতিভেদ-প্রথা বুঝা এবং গ্রহণ করা বোধ হয় ইহার অপেক্ষাও কঠিন। আমি গর্ব করিয়া বলিতে পারি না যে, এ বিষয়ে গান্ধীজীর মতামত ব্যাখ্যা করিয়া ইউরোপীয়ানদিগকে তাহা গ্রহণ করাইতে আমি সমর্থ হইব। তবে, গান্ধীজী যেভাবে এই সমস্যার ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইবে যে, ইহার মধ্যে গর্ব বা সামাজিক দাম্ভিকতার লেশমাত্র নাই; ইহা বাস্তবিক পক্ষে বিভিন্ন স্তর ও শ্রেণীকে বিভিন্ন কর্তব্যের ভার দেওয়া মাত্র।

"আমার মতে বর্ণাশ্রম-ধর্ম মানব-প্রকৃতির সহজাত। হিন্দুধর্ম ইহাকে বিজ্ঞানসম্মত করিয়া তুলিয়াছে মাত্র।"

তবে গান্ধীজী এই জাতিভেদকে মাত্র চারিটি শ্রেণীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখিয়াছেন: ব্রাহ্মণ (বুদ্ধি ও অধ্যাত্মজীবী শ্রেণী), ক্ষত্রিয় (শাসক ও সামরিক শ্রেণী), বৈশ্য (বণিক শ্রেণী) এবং শূদ্র। এই বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে তিনি উচ্চতা বা নীচতা স্বীকার করেন না। ইহা কেবল বিভিন্ন পেশা মাত্র, আর কিছুই নহে। কেবল ক্রিয়া-কর্তব্যের ব্যাপার মাত্র, সুযোগ-সুবিধার নহে।[১৬]

"আমার বিশ্বাস কাহাকেও উচ্চ আসনে তুলিয়া ধরা বা কাহাকেও নিম্নস্তরে ঠেলিয়া ফেলা, ইহা হিন্দুধর্মের সহজ প্রকৃতির বিরুদ্ধে। ভগবানের সৃষ্টির সেবার জন্য সবাই জন্মিয়াছে। ব্রাহ্মণ তাঁহার জ্ঞানের দ্বারা, ক্ষত্রিয় তাঁহার রক্ষণ-শক্তির দ্বারা, বৈশ্য তাঁহার বাণিজ্য-নৈপুণ্যের দ্বারা এবং শূদ্র তাঁহার দৈহিক শ্রমের দ্বারা সকলের সেবা করিবেন। অবশ্য ইহা হইতে এই অর্থ হয় না যে, ব্রাহ্মণকে কোনোরূপ

---

[১৫] গান্ধীজী বিগ্রহপূজার বিরুদ্ধে নয়। "মূর্তি আমার মধ্যে কোনো প্রকার শ্রদ্ধার মনোভাব জাগায় না।......মূর্তি-পূজা মানব-প্রকৃতির অঙ্গ", ইত্যাদি। ইয়ং ইণ্ডিয়া, অক্টোবর ৬, ১৯২১।

গো-সেবা-ধর্ম সম্পর্কে ১৯২০ সালের ১৬ই মার্চ, ৮ই জুন ও ৪ঠা আগস্ট, এবং ১৯২১ সালের ৬ই অক্টোবর তারিখের ইয়ং ইণ্ডিয়া দ্রষ্টব্য।

[১৬] যখন যুগ যুগ ধরিয়া আদিম শ্রেণীগুলি জাতিভেদের পাষাণ প্রাচীর গড়িয়া তুলিল, তখন উপনিষদ্ তাহার প্রতিবাদ করিয়াছিল।

শারীরিক শ্রম করিতে বা আত্মরক্ষার কর্তব্য পালন করিতে বা অন্যান্য কার্য করিতে হইবে না। জন্মই বিশেষভাবে ব্রাহ্মণকে জ্ঞানজীবী করিয়া তুলিবে। জন্মস্বত্ব এবং শিক্ষার দ্বারা তিনি অপরকে জ্ঞানদানের সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত হইবেন। অপরপক্ষে শূদ্র জ্ঞানের অধিকারী হইতে চাহিলে তাঁহাকে বিরত করিবার কিছুই থাকিবে না। কেবল মাত্র দেহের দ্বারাই তিনি সর্বাপেক্ষা সুন্দরভাবে সবার সেবা করিতে পারিবেন। সেবার জন্যে কোনো বিশেষ গুণের অধিকারী হইলে তাঁহাকে ঈর্ষা করিবার কোনো কারণই থাকিবে না। যে-ব্রাহ্মণ জ্ঞানের অধিকারী বলিয়া উচ্চতার দাবি করেন, তাঁহার পতন অবশ্যম্ভাবী। কারণ, তিনি বিন্দুমাত্র জ্ঞানেরও অধিকারী নহেন। বর্ণাশ্রম-ধর্ম হইল আত্মসংযম, এবং অপচয়ের হাত হইতে শক্তির সংরক্ষণ।

সুযোগ-সুবিধার উপর নহে, ত্যাগের উপরই বর্ণাশ্রম ধর্ম প্রতিষ্ঠিত। তাহা ছাড়া আমাদের আত্মার দেহান্তর-ভ্রমণের কথা ভুলিলে চলিবে না। ব্রাহ্মণের হইতে শূদ্রের এবং শূদ্রের হইতে ব্রাহ্মণের দেহে আত্মা যেভাবে ক্রমাগত ভ্রমণ করিতে থাকে, তাহাতেও প্রকৃতি একরকম ভারসাম্যের ব্যবস্থা করিয়া দেন।"

এই শ্রেণী-বিভাগের সহিত 'পারিয়া'দের কোনো প্রকার সম্পর্ক নাই। কারণ এই শ্রেণীগুলি অবস্থায় এবং অধিকারে সমান, কেবলমাত্র কার্যে পৃথক। গান্ধীজী কিভাবে এই সামাজিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে অক্লান্ত সংগ্রাম করিয়াছেন, তাহা আমরা শীঘ্রই দেখিব। এবং ইহাই তাঁহার ঋষিত্বের সর্বাপেক্ষা মর্মস্পর্শী দিক। গান্ধীজীর কাছে এই অন্যায় হিন্দুধর্মের লজ্জা, এক সত্য-নীতি-সূত্রের করুণ অধঃপতন এবং কলঙ্ক; ইহা তাঁহাকে অত্যন্ত পীড়া দেয়।

"আমি পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে চাহি না। কিন্তু যদি পুনরায় জন্মগ্রহণ করি, তবে যেন অস্পৃশ্যদের মধ্যেই জন্মি, তাহাতে আমি তাহাদের অসুবিধার অংশ গ্রহণ করিতে পারিব, তাহাদের মুক্তির জন্যে খাটিতে পাইব।"[১৭]

গান্ধীজী অস্পৃশ্য শ্রেণীর একটি ছোট মেয়েকে পোষ্য গ্রহণ করিয়াছেন। এই ফুটফুটে সাত বছরের প্রাণীটির সহিত তিনি পরম স্নেহে আলাপ করেন; এমনিভাবে তাঁহার গৃহকোণ হাসি-কান্নায় ভরিয়া উঠে।

গান্ধীজীর এই সকল বিশ্বাসের আবরণে যে দেবোপম একটি হৃদয় গোপন রহিয়াছে, তাহা দেখাইবার জন্য আমি যথেষ্ট বলিয়াছি। সত্য, ইনি হইলেন রাশিয়ান টলস্টয়ের অপেক্ষা আরো স্নেহ-কোমল এক টলস্টয়, আরো সহজে সন্তুষ্ট এক টলস্টয়। এবং বলিতে পারি, আরো 'স্বাভাবিকভাবে' খ্রীষ্টান এক টলস্টয়। টলস্টয় খ্রীষ্টান ছিলেন যতোখানি স্বভাবে, তাহার অপেক্ষা ছিলেন অনেক বেশি ইচ্ছায়।

গান্ধীজী পাশ্চাত্য-সভ্যতাকে যে নিন্দা করিয়াছেন, তাহার মধ্যেই তাঁহার উপর টলস্টয়ের প্রভাব সর্বাপেক্ষা বাস্তব হইয়া উঠিয়াছে।

---

[১৭] ২৭শে এপ্রিল, ১৯২১।

রুশোর সময় হইতেই ইউরোপের অধিকাংশ উদারমনা ব্যক্তিই আধুনিক সভ্যতাকে অবিরাম আক্রমণ করিয়া আসিতেছেন। নব-জাগ্রত ভারত আক্রমণের এই সমস্ত পুঁথিপত্রের মধ্যে তাহার শাসক-গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে অপরাজেয় অস্ত্রের সন্ধান করিয়াছে মাত্র। গান্ধীজীও তাহাই করিয়াছেন এবং তাঁহার 'হিন্দ্ স্বরাজ্য' পুস্তিকায় এই সকল নিন্দামূলক পুস্তকের একটি তালিকাও তিনি দিয়াছেন। এই তালিকাভুক্ত পুস্তকগুলির মধ্যে ইংরেজদের নিজেদের লেখাও অনেকগুলি রহিয়াছে। কিন্তু সবার অপেক্ষা সেরা বই যাহাকে অপ্রমাণ করিবার কোনো উপায়ই নাই, তাহা হইল বহুনিপীড়িত নিঃশেষিত জাতির,—দেশের প্রধান অপরাধীদের নামে যাহাদের উপর অত্যাচার হইয়াছে—তাহাদের রক্ত দিয়া ইউরোপীয় সভ্যতার স্বরচিত কাহিনী, সভ্যতার যুদ্ধ। গত যুদ্ধের এই কাহিনী পৃথিবীর চোখের সামনে ভণ্ডামি, লোভ এবং নৃশংসতার সকল মুখোসই খুলিয়া দিয়াছে। ইউরোপের লজ্জাহীনতা সেদিন এমন প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল যে, সে নিজের উলঙ্গ মূর্তি দেখাইবার জন্য আফ্রিকা এবং এশিয়ার জনসাধারণকেও আমন্ত্রণ করিয়া বসিয়াছিল।

"আজ যে সভ্যতা ইউরোপে প্রবল হইয়া উঠিয়াছে, তাহার শয়তানী[১৮] স্বরূপ প্রকাশ পাইয়াছে গত যুদ্ধে।

বিজয়ীরা ন্যায়ের নামে সাধারণের সকল প্রকার নীতির সূত্রকেই ভাঙিয়া দিয়াছে, কোনো মিথ্যাকেই উচ্চারণের অযোগ্য অন্যায় বলিয়া মানে নাই। তাহাদের সমস্ত অপরাধের পিছনে যে উদ্দেশ্য ছিল, তাহা ছিল ভয়াবহরূপে দুর্নীতিপরায়ণ।... ইউরোপ খ্রীষ্টান নহে। ইহা কুবেরের পূজারী মাত্র।"[১৯]

ভারত এবং জাপান, উভয় দেশেই এই ধরনের চিন্তা বহুবার প্রকাশ পাইয়াছে। এমন কি, এ কথা যাঁহারা প্রকাশ্যে ঘোষণা করা বিচক্ষণতার কাজ বলিয়া মনে করেন নাই, তাঁহারাও অন্তরে অন্তরে ইহাকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছেন। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের 'ধ্বংস-তান্ডব এবং বিজয়ের' এই ভয়াবহ ফলাফলগুলি নিতান্ত উপেক্ষণীয়ও নহে। গান্ধীজী কিন্তু ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বেই পাশ্চাত্য সভ্যতার সত্যিকারের স্বরূপটি ধরিয়া ফেলিয়াছিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় তাঁহার বিশ বৎসরের জীবনেই ইহা ছদ্মবেশ খুলিয়া তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি তাঁহার—'হিন্দ্ স্বরাজ্য' পুস্তকে আধুনিক সভ্যতাকে 'ভয়ংকর অমঙ্গল' বলিয়া ঘোষণা করেন।

গান্ধীজী বলেন, ইহা নামেই সভ্যতা। ইহা হিন্দুর ভাষায়, "অন্ধকারের যুগ।" ইহা বস্তুতান্ত্রিকতাকে ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য করিয়া তুলিয়াছে। ইহার ফলে ধন-সম্পদলাভের জন্যে ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছেন ইউরোপীয়ানরা। ধন-সম্পদের কাছে তাঁহারা করিয়াছেন আত্মবিক্রয়। এই ধন-সম্পদ তাঁহাদিগকে তাঁহাদের শান্তি ও আভ্যন্তরিক জীবন হইতে বঞ্চিত করিয়াছে। দুর্বল ও শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে ইহা

---

[১৮] এই কথাটি গান্ধীজীর রচনার মধ্যে প্রায়ই দেখা যায়। ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১৯শে জুন, ১৯২১।

[১৯] ৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯২৪, ইয়ং ইণ্ডিয়া।

নরক। ইহা জাতির জীবনীশক্তিকে হ্রাস করিয়া দেয়। এই শয়তানি অচিরেই ইহার নিজের আগুনে নিজেই ধ্বংস হইয়া যাইবে। এই সভ্যতাই হইল ভারতের আসল শত্রু, ইংরেজদের অপেক্ষাও বড় শত্রু। কারণ ব্যক্তিগতভাবে ইংরেজরা খারাপ নহেন, তাঁহারা কেবল তাঁহাদের এই সভ্যতার ব্যাধিতে সংক্রামিত হইয়া পাগল হইয়া উঠিয়াছেন মাত্র। তাই গান্ধীজী তাঁহার স্বদেশবাসীদের মধ্যে যাঁহারা ভারত হইতে ইংরেজদের তাড়াইয়া ভারতকে "একটি সভ্য রাষ্ট্রে (আধুনিক অর্থে, সভ্য)" পরিণত করিতে চান, তাঁহাদের সহিত অনেক যুদ্ধ করিয়াছেন। তিনি বলেন, "ইহাতে ব্যাঘ্র থাকিবে না, অথচ ব্যাঘ্রের প্রকৃতি থাকিবে।" না! আমাদের সমস্ত শক্তিকে নিয়োগ করিতে হইবে পশ্চিমী সভ্যতার বিরুদ্ধে!

তিন শ্রেণীর মানুষকে গান্ধীজী সর্বাপেক্ষা অধিক নিন্দা করিয়াছেন : উকিল, ডাক্তার এবং শিক্ষক।

শিক্ষকদের প্রতি তাঁহার যে বিরুদ্ধতা তাহা বুঝা যায়। কারণ, তাঁহারা ভারতীয়দিগকে তাহাদের নিজেদের ভাষা ও চিন্তাকে ভুলিতে শিখাইয়াছেন, তাঁহারাই ভারতীয় শিশুদের ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়াছেন এক জাতীয় অধঃপতনের দুর্বহ বোঝা। কেবল তাহাই নহে, স্কুলের মাস্টাররা ছেলেমেয়েদের মন ও চরিত্রের দিকে আদৌ লক্ষ্য দেন না, তাঁহারা হেয় করিতে শেখান দৈহিক শ্রমকে। যে জাতির শতকরা আশি ভাগ লোক কলকারখানার মজুর, সে জাতির সকলকেই যে একই ধরনের সাহিত্যিক শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহা অপরাধের অপেক্ষা কোনো অংশেই কম নহে।...... উকিলের পেশা, ইহা দুর্নীতিমূলক। ভারতের আদালতগুলি বৃটিশ শক্তির হাতের যন্ত্র মাত্র; সেগুলি ভারতীয়দের মধ্যে বিরোধের উশ্‌কানি দেয়, নিজেদের মধ্যে কলহ এবং যুদ্ধবিগ্রহকে বহু গুণে বাড়াইয়া তোলে। মানুষের মধ্যে যে সকল কুপ্রবৃত্তি আছে, আদালত সেগুলিকে কাজে লাগাইবার উপায় মাত্র। আর ডাক্তারদের সম্বন্ধে গান্ধীজী বলেন, ডাক্তারি-পেশা তাঁহাকে প্রথমে আকৃষ্ট করিয়াছিল। কিন্তু শীঘ্রই তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, এই পেশাও যথেষ্ট সম্মানজনক নহে। পাশ্চাত্য ঔষধ-ব্যবস্থা দেহের ব্যাধিকে সারাইতে চেষ্টা করে মাত্র; কিন্তু এই সকল ব্যাধির মূল কারণ,—মানুষের কাম ও পাপ—এগুলিকে ধ্বংস করার তাহারা কোনো চেষ্টাই করে না। বরং এমন কি ইহাও বলা যাইতে পারে যে, পশ্চিমী চিকিৎসার ব্যবস্থা পাপকে প্রশ্রয় দেয়। কারণ, ইহা পাপীদের বিপদের আশঙ্কা কমাইয়া তাহাদিগকে পাপের পথে চলিতে উৎসাহিত করে। এই চিকিৎসা মানুষের নৈতিক অধঃপতন ঘটায় এবং "কৃষ্ণ জাদুর"[২০] ব্যবস্থায় তাহাদিগকে পৌরুষহীন করিয়া তোলে। ইহার ফলে দেহ এবং আত্মার বীর্যবান নিয়ন্ত্রণে মানুষের মন নির্বিকার হইয়া পড়ে। ঔষধের এই মিথ্যা-ব্যবস্থার পরিবর্তে গান্ধীজী

---

[২০] এ কথা ভুলিলে চলিবে না যে, ইউরোপীয় ভেষজের বিরুদ্ধে গান্ধীজীর প্রধান আপত্তিগুলির মধ্যে ব্যবচ্ছেদের আশ্রয় গ্রহণ করা হইল অন্যতম—"মানুষের সর্বাপেক্ষা কলঙ্কময় অপরাধ এই ব্যবচ্ছেদ।"

আমাদিগকে তাঁহার সত্যিকারের রোগ-নিবারক ঔষধের ব্যবস্থা দিতে পারিয়াছেন। ইহা কি ধরনের ব্যবস্থা, তাহা তাঁহার অন্যতম জনপ্রিয় 'এ গাইড টু হেল্থ্' পুস্তকে বর্ণিত হইয়াছে। এই বইখানি তাঁহার বিশ বৎসরের অভিজ্ঞতার ফলে রচিত। ইহা নীতি এবং চিকিৎসা, এই দুইটি বিষয়েরই আলোচনা; "কারণ, ব্যাধি কেবল আমাদের কর্মের ফলমাত্র নহে, ইহা আমাদের চিন্তার ফসলও।" "সকল রোগের জন্মের মূল একই,—অর্থাৎ, স্বাস্থ্যের প্রাকৃতিক নিয়মগুলি পালন না করা।" সুতরাং রোগনিবারণের জন্য নিয়ম নির্দেশ করা অপেক্ষাকৃত সহজও। দেহ ভগবানের মন্দির; সুতরাং ইহাকে সর্বদা পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র রাখিতে হইবে। গান্ধীজীর চিকিৎসাসংক্রান্ত উপদেশাবলীর মধ্যে সুপ্রচুর সুবুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। যদিও তাহাতে চিকিৎসার সুপরীক্ষিত বিধিব্যবস্থার প্রতি তাঁহার এক প্রকার একগুঁয়ে বিরোধী মনোভাবের এবং নীতির সম্বন্ধে 'পিউরিটান' কৃচ্ছ্রতার প্রমাণও মিলে।[২১]

কিন্তু বর্তমান সভ্যতার (লৌহযুগের) আত্মা হইল যন্ত্র। যন্ত্রের এই দানব-বিগ্রহকে অপসারণ করিতে হইবে। ভারতবর্ষকে যন্ত্রের গোলামি হইতে মুক্ত করিবার জন্য গান্ধীজী সোৎসাহে এক শপথ গ্রহণ করিয়াছেন। যন্ত্রের গোলামি সহ ভারতের স্বাধীনতা আসিবার অপেক্ষা বৃটিশ বাজারের কাছে ভারতের গোলামি করাই গান্ধীজীর মতে শ্রেয়। "ভারতে মিলের সংখ্যা বাড়াইবার অপেক্ষা ম্যাঞ্চেস্টারে টাকা পাঠানোও অনেক মঙ্গলজনক। একজন ভারতীয় রক্ফেলার আমেরিকান রক্ফেলারের অপেক্ষা কোনো অংশেই ভালো হইবে না। যন্ত্র মানুষকে ক্রীতদাসের জাতিতে পরিণত করে। যৌন অপরাধের মতোই অর্থ মানুষকে অসহায় করিয়া তোলে।" ("হিন্দ স্বরাজ্য"।)

আধুনিক-মনা ভারতীয়েরা প্রশ্ন করেন, "ট্রেন, ট্রাম, কলকারখানা না থাকিলে ভারতের কি অবস্থা হইবে?" জবাবে গান্ধীজী বলেন, "এগুলিকে বাদ দিয়া পূর্বে ভারতের কেমন করিয়া চলিত?"

"কতো সাম্রাজ্যের উত্থান-পতন ঘটিয়াছে, কিন্তু ভারত একাকী তাহারই মধ্যে হাজার হাজার বছর ধরিয়া অবিচল দাঁড়াইয়া আছে। আর সমস্ত কিছুই আজ চলিয়া গিয়াছে। কেবল ভারতবর্ষ অর্জন করিয়াছে আত্ম-শাসনের অধিকার এবং আনন্দের পরমার্থ। ইহা যন্ত্র চাহে নাই, নগর কামনা করে নাই। প্রাচীন চরকা এবং ইহার দেশীয় শিক্ষাই ইহাকে নিঃসন্দেহে জ্ঞান ও শুভের অধিকারী করিয়াছে। তাই আমরা আজ প্রাচীন সারল্যে ফিরিয়া যাইতে চাই—এক লম্ফে নহে, বিভিন্ন নেতার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া, ধীরে ধীরে, ধৈর্যের সঙ্গে।"

ইহাই হইল গান্ধীজীর চিন্তার সার কথা এবং ইহা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণও। ইহাই 'প্রগতি' এবং ইউরোপীয় বিজ্ঞানকে অস্বীকারের সূত্র দিয়াছে।[২২] গান্ধীজীর

---

২১ বিশেষ করিয়া যৌন সম্পর্কের ব্যাপারে তাঁহার কঠোর নীতি আমাদিগকে সেণ্ট পলের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

২২ ইউরোপীয় বিজ্ঞানের অনুপস্থিতিতে যাহাতে বৈজ্ঞানিক গবেষণা চলিতে পারে,

এই মধ্যযুগীয় বিশ্বাসের কিন্তু বিপদও রহিয়াছে। মানুষের মানস-শক্তি আজ যে আগ্নেয়গিরির তেজে উৎসারিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহার সহিত ইহার সংঘর্ষ ঘটিতে পারে এবং সেই সংঘর্ষে ইহা চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাইতেও পারে। "মানুষের মানস-শক্তি" না বলিয়া "মানুষের অন্যতম মানস-শক্তি" বলাই ভালো। কারণ, আমি যেমনটি ভাবি, তেমনি ভাবেই যদি পৃথিবীর সমস্ত মানস-শক্তিকে একটি ঐকতানের মতো করিয়া ভাবা যায়, তবে বুঝা যাইবে, বহু বিভিন্ন সুরের সমন্বয়ে উহা গঠিত, এবং প্রত্যেক বিভিন্ন সুরই আপন আপন পথ ধরিয়া উৎসারিত হইতেছে। আমাদের যৌবনচঞ্চল পশ্চিম আজ আপনার সুরের ছন্দে ভাসিয়া চলিয়াছে, ভাবিতেছে না যে এই ঐকতানের শ্রেষ্ঠ ভূমিকা সর্বদা তাহারই থাকিবে না, ইহার গতির নিয়মে পতন রহিয়াছে, বিপরীত পানে দোলা রহিয়াছে, নূতন করিয়া আরম্ভ রহিয়াছে। ভাবিতেছে না যে, মানব সভ্যতার ইতিহাস বহু সভ্যতার ইতিহাসের সমষ্টি—কেবল বিশেষ একটি সভ্যতার ইতিহাস মাত্র নহে।

ইউরোপীয়ানরা 'প্রগতির' যে মত পোষণ করেন, তাহা বিশেষভাবে আলোচনা না করিয়া, আজ জগৎ যে পথে চলিতেছে, এবং গান্ধীজী যে-মহান্ শপথ গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা সেই চলার পরিপন্থী কেবল মাত্র এই ব্যাপারটি লক্ষ্য করিয়াই আমাদের ধরিয়া লইলে চলিবে না যে গান্ধীজীর এই বিশ্বাস টিকিবে না, ধ্বংস হইয়া যাইবে। একথা ভাবিলে প্রাচ্যের মনকে ভুল বোঝা হইবে। গোবিনো বলেন, "এশিয়াবাসীরা সকল বিষয়েই আমাদের অপেক্ষা অনেক বেশি একগুঁয়ে। যদি প্রয়োজন হয়, তাহাদের আশা-উদ্দেশ্য পূর্ণ করিবার জন্য তাহারা পুরুষের পর পুরুষ অপেক্ষা করিয়া থাকে। এবং এই দীর্ঘকালীন অপেক্ষার ফলেও তাহারা তাহাদের ধারণা, তাহাদের প্রাণশক্তি বা তাহাদের উদ্যম বিন্দুমাত্রও হারায় না।" বহু শতাব্দীও হিন্দুকে ভয় দেখাইতে পারিবে না।

গান্ধীজী তাঁহার চেষ্টার সাফল্য যেমন এক বছরের মধ্যে পাইতে প্রস্তুত, তেমনি, যদি প্রয়োজন হয়, শতাব্দীর পর শতাব্দী অপেক্ষা করিয়া থাকিতেও তাঁহার কোনো আপত্তি নাই। সময় যদি তাহার পদক্ষেপ মন্থর করিয়া ফেলে, তিনি তাহাকে দ্রুত করিয়া তুলিতে চান না, তিনিও নিজে মন্থর হইয়া চলেন। তিনি যদি দেখেন যে সকল আমূল সংস্কার প্রবর্তন করিতে চান, তাহা বুঝিতে বা কার্যত করিতে ভারতবর্ষ যথেষ্ট প্রস্তুত নহে, তবে কেমন করিয়া সম্ভবের সঙ্গে নিজের কর্মের ধারাকে খাপ খাওয়াইয়া লইতে হইবে, তাহাও তিনি জানেন।

গান্ধীজী তাহার ব্যবস্থা করিয়াছেন। তিনি ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিকদের উদ্যম ও ত্যাগের প্রশংসা করেন। তাঁহার মতে, ইহা প্রায়ই হিন্দু ধার্মিকদের উৎসাহ এবং আত্মবলির অপেক্ষা অনেক উচ্চস্তরের। সে মানস-শক্তি ইউরোপকে প্রাণবান করিয়া তুলিয়াছে, তাহারও তিনি প্রশংসা করেন। তিনি কেবল আক্রমণ করেন যে-পথে এই মানস-শক্তি আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, তাহাকেই। তাহা সত্ত্বেও ইউরোপীয় বিজ্ঞানের প্রতি গান্ধীজীর বিরোধিতা প্রবল এবং স্পষ্ট। এই কারণেই, আমরা পরে দেখিব, রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজীর এই মধ্যযুগীয়তা সম্পর্কে ন্যায়সঙ্গতভাবেই প্রতিবাদ করেন।

১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে আমরা যখন যন্ত্রের এই আপোসহীন শত্রুকে নিম্নলিখিত কথাগুলি বলিতে শুনি, তখন বিস্মিত না হইয়া পারি না :

"যন্ত্রের তিরোধানে আমি আদৌ দুঃখিত হইব না। কিন্তু যন্ত্রের প্রতি বস্তুত আমার কোনো ঘৃণা নাই।" অথবা, আবার, "(ব্যতিক্রমহীন, সীমাহীন) ভালোবাসার নিয়মই আমার অস্তিত্বের নিয়ম। কিন্তু যে সকল রাজনীতিক ব্যবস্থার আমি প্রশংসা করি, সেগুলির প্রতি এই নিয়ম সর্বত্রই ব্যবহৃত হয়, ইহাও আমি চাই না......তাহার অর্থ হইবে পূর্ব হইতেই পরাজয়কে মানিয়া লওয়া। জনতাও এই নিয়ম সর্বত্র পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে মানিয়া চলিবে, এমন আশা করাও যুক্তিযুক্ত হইবে না।......"

"আমি স্বপ্নবিলাসী নহি, আমি কর্মী আদর্শবাদী।" (১১ই আগস্ট, ১৯২০)। গান্ধীজীর এই আত্মবর্ণনা নির্ভুল। মানুষ যাহা দিতে পারে, তিনি তাহাই মাত্র মানুষের কাছে দাবি করেন। কিন্তু যতোটুকু তাহাদের পক্ষে দেওয়া সম্ভব, তিনি তাহার সবটুকুই দাবি করেন। বস্তুত, ভারতের এই দাবিটুকুও তুচ্ছ করিবার মতো নহে। কারণ, ভারতের জনসংখ্যা বিশাল,[২০] ঐতিহ্যে তাহারা সমৃদ্ধ, আত্মার উন্নয়নেও তাহারা সম্পদশালী। প্রথম মিলনের দিন হইতেই দেশের জনসাধারণ এবং গান্ধীজীর মধ্যে একটি পূর্ণ ঐক্যের বন্ধন ঘটিয়াছে। তাঁহারা তাঁহাদের মনোভাব বাহিরে প্রকাশ না করিয়াও পরস্পরকে বুঝিয়াছেন। গান্ধীজী জানেন, জনসাধারণের নিকট হইতে তিনি কি দাবি করিতে পারেন এবং জনসাধারণও জানেন, গান্ধীজী তাঁহাদের নিকট কি দাবি করিতে পারেন। তাঁহাদের মধ্যে প্রথম সর্বশ্রেষ্ঠ বন্ধন হইল স্বরাজ বা ভারতে স্বায়ত্ত-শাসনের অধিকার।

গান্ধীজী লিখিয়াছেন, "আমি জানি, জাতির উদ্দেশ্য অহিংসা নহে, স্বরাজ।"

এমন কি তিনি সেই সঙ্গে নিম্নলিখিত কথাগুলিও বলেন, যাহা বিস্ময়ে আমাদিগকে বাস্তবিক হতবাক করিয়া দেয় :

"শাসক সম্প্রদায়ের হিংসার দ্বারা গোলাম করিয়া রাখার অপেক্ষা হিংসার দ্বারা ভারতকে যদি স্বাধীন দেখি, তবে তাহাও ভালো।" কিন্তু পরক্ষণেই তিনি নিজেকে সংশোধন করিয়া লন। "ইহা অসম্ভবের কল্পনা মাত্র। আত্মার শক্তির দ্বারাই স্বরাজ লাভ সম্ভব। এবং ইহাই ভারতের উপযুক্ত অস্ত্র। এই অস্ত্র প্রীতির, এই শক্তি সত্যের—ইহা সত্যাগ্রহ।"

এই অপরাজেয় অস্ত্রের সত্যিকারের স্বরূপ এবং গোপন শক্তিকে ভারতীয় জনসাধারণের কাছে তুলিয়া ধরার মধ্যেই নিহিত আছে গান্ধীজীর প্রতিভা।

"নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ" হইতে তাঁহার কর্মধারাকে পৃথক করিবার জন্য গান্ধীজী দক্ষিণ আফ্রিকায় "সত্যাগ্রহ" শব্দটির রচনা করেন। এই পার্থক্যটির উপর বিশেষভাবে জোর দেওয়া প্রয়োজন। কারণ এই "নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ" বা "নির্বিরোধ" নামেই ইউরোপীয়ানরা গান্ধীজীর আন্দোলনকে বর্ণনা করিয়া থাকেন। ইহার অপেক্ষা

---

২০ পৃথিবীর জনসংখ্যার এক-পঞ্চমাংশ।

আর কিছুই সত্য হইতে পারে না। নিষ্ক্রিয়তার প্রতি এই অক্লান্ত যোদ্ধার যতোখানি অশ্রদ্ধা আছে, তেমনটি এ-পৃথিবীতে আর কাহারো নাই। তাঁহার আন্দোলনের মূল কথা হইল "সক্রিয় প্রতিরোধ—প্রেমের দ্বারা, ত্যাগের দ্বারা।" এই ত্রয়ী শক্তি-ই প্রকাশ লাভ করিয়াছে "সত্যাগ্রহ" শব্দটির মধ্যে।

গান্ধীজীর অন্তরালে কাপুরুষদিগকে আত্মগোপনের সুযোগ দিয়া লাভ নাই। গান্ধীজী তাঁহার দল হইতে তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিবেন। হিংসার মনোভাবে উদ্দীপ্ত মানুষ নতজানু ভীরু কাপুরুষের অপেক্ষা শত গুণে শ্রেয়।

"কাপুরুষতা এবং হিংসা, এ দুইয়ের মধ্যে আমি হিংসাকেই বরণ করিব। আমি হত্যা না করিয়া মরিবার প্রশান্ত সাহস অর্জন করিতে চাই। কিন্তু আমি ইহাও চাই যে, যে ব্যক্তি মরিবার সাহস পাইবে না, সে যেন বিপদের মুখ হইতে লজ্জাজনকভাবে না পলাইয়া মারিবার কৌশলটুকুও আয়ত্ত করে। কারণ, যে পলায়, সে মনে মনে হিংসার কাজ করে। সে পলাইয়াছে, কারণ সে মারিতে সাহস পায় নাই।...সমস্ত জাতিকে নির্বীর্য করিয়া তুলিবার অপেক্ষা আমি হিংসাকেই শ্রেয় মনে করি[২৪]...কিন্তু আমি জানি হিংসার অপেক্ষা অহিংসা অসংখ্য গুণে শ্রেয়, শাস্তির অপেক্ষা ক্ষমাই অধিক পৌরুষের। শাস্তি দিবার যখন ক্ষমতা থাকে, তখনই শাস্তি না দেওয়ার নাম ক্ষমা। আমি ভারতকে শক্তিহীন মনে করি না। ঐ কয়েক হাজার মাত্র ইংরেজ ভারতের ত্রিশ কোটি মানুষকে ভয় দেখাইয়া ভাগাইতে পারে না।...তাহা ছাড়া, দৈহিক শক্তির মধ্যে তেজ নাই, তেজ আছে দুর্বার ইচ্ছার মধ্যেই।...অহিংসা আততায়ীর কাছে সদয় আনুগত্য নহে। অহিংসার অর্থ হইল আত্মার সকল তেজ দিয়া অত্যাচারীর ইচ্ছার প্রতিরোধ করা। এমনি ভাবেই, একটি মাত্র মানুষও একটি সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে এবং তাহার পতন ঘটাইতে পারে।"

কিন্তু কিসের বিনিময়ে? মরণের বিনিময়ে। মরণই সেই মহান নিয়ম।

"মৃত্যু হইতেই আসে জীবনের অপরিহার্য শর্ত।[২৫] বীজের মৃত্যুতেই ঘটে শস্যের জন্ম। যন্ত্রণার মধ্য দিয়া পরিশোধনের সনাতন নিয়ম না মানিয়া কেহ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে আশা করিতে পারে না।...যে ব্যক্তি যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছে, তাহার যন্ত্রণার পরিমাণ দিয়াই পরিমাপ হয় প্রগতির। এই যন্ত্রণা যতোই নির্মল হয়, ততোই অধিক হয় প্রগতি। সচেতন যন্ত্রণা-ভোগই হইল অহিংসা। আমি ভারতের সম্মুখে সেই যন্ত্রণার এবং আত্মবলির পুরাতন বিধি পুনরায় স্থাপিত করিবার সাহস করিয়াছি। সকল ঋষিই হিংসার মধ্যে অহিংসার নিয়ম আবিষ্কার করিয়াছিলেন। তাঁহারা নিউটনের অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠতর প্রতিভা ছিলেন, ওয়েলিংটনের অপেক্ষাও ছিলেন বড়ো যোদ্ধা। তাঁহারা নিজেরা অস্ত্রের ব্যবহার জানিতেন এবং জানিতেন অস্ত্রের অব্যবহারিকতা।...অহিংসার ধর্ম কেবল ঋষি এবং সন্তদের জন্য

---

[২৪] ৪ঠা আগস্ট, ১৯২০; ১১ই অক্টোবর, ১৯২১।
[২৫] ৯ই মার্চ, ১৯২০।

নহে। ইহা সমস্ত জনসাধারণের জন্যও। জীবজগতে মানব-শ্রেণীর ইহাই ধর্ম; হিংসাই যেমন ধর্ম পশুদের। পশুদের মধ্যে মানস-শক্তি সুপ্ত থাকে। কিন্তু মানুষের মহিমা কোনো উচ্চতর নিয়মের কাছে—এই মানস-শক্তির কাছে—অনুগত হইতে চায়।... আমি চাই, ভারত অহিংসার নিয়ম পালন করুক। আমি চাই, সে এই নিয়মের শক্তি পূর্ণভাবে অধিগত করুক। ভারত অবিনশ্বর এক আত্মার অধিকারী। এই আত্মা সমস্ত পৃথিবীর বস্তু-শক্তিকে বাধা দিবে।...ভারত যদি কোনোদিন এই নিয়মকে বুঝিতে বা ইহার শ্রেষ্ঠতা লক্ষ্য করিতে অসমর্থ হয় তবে সেদিন আমি হিমালয়ের নির্জনতায় আশ্রয় লইব।..." (৬ই এপ্রিল, ১৯২১)

কিন্তু গান্ধীজী এ বিষয়ে কখনো হতাশ হন নাই। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে যখন তিনি সত্যাগ্রহের অভিযান সুরু করিতে সিদ্ধান্ত করিলেন, তখন ভারতের উপর তাঁহার বিশ্বাস অটুট ছিল। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে কয়েকটি কৃষি কলহের ব্যাপারে তিনি সত্যাগ্রহের শক্তিকে ইতিপূর্বেই যথেষ্ট পরীক্ষা করিয়া লইয়াছিলেন।

তখনো রাজনীতিক বিদ্রোহের কোনো কথা ছিল না। তখনো গান্ধী ছিলেন ইংরেজদের প্রতি বিশ্বস্ত। ইংরেজের প্রতি তাঁহার এই বিশ্বাস ততোদিন থাকিবে, যতোদিন ইংল্যান্ড তাহার বিশ্বস্ততায় বিন্দুমাত্রও আশার আলোক দেখাইবে। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি পর্যন্ত তিনি সাম্রাজ্যের সহিত সহযোগিতা করিবার নীতিরই সমর্থন করিয়া আসিয়াছিলেন—এবং এই জন্যে ভারতীয় জাতীয়তাবাদীরা তাঁহার নিন্দাও করিয়াছিলেন।[২৬] সরকারী বিরোধিতার এই প্রথম বৎসরে তিনি অকপটভাবে লর্ড হাণ্টারকে প্রতিশ্রুতি দেন যে, সত্যাগ্রহীরা সর্বাপেক্ষা অধিক সংস্কারপন্থী প্রজা হইয়াই থাকিবে। ভারতসরকারের কোনো সংকীর্ণ একগুঁয়েমিই ভারতের এই নীতিনিয়ামককে এই বিশ্বাসের বন্ধন ছিন্ন করাইতে যে সমর্থ হইত না, ইহাও নিঃসন্দেহ। কারণ, গান্ধীজী অনুভব করিতেন, এই বিশ্বাসের সঙ্গে তিনিও অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।

এইরূপে সরকার কোনো অন্যায় আইন পাস করায় সত্যাগ্রহ তাঁহার সংস্কার-পন্থী প্রতিবাদ হিসাবে প্রথমে আত্মপ্রকাশ করিল। সত্যাগ্রহীরা যাঁহারা সাধারণ সময়ে আইন মানিয়া চলিতেন, তাঁহারাই ইচ্ছা করিয়া অসম্মানজনক আইনগুলি অমান্য করিতে লাগিলেন। এবং ইহাতেও যদি ন্যায়ের পুনঃপ্রতিষ্ঠা সম্ভব না হয়, তাহা হইলে তাঁহারা এই অমান্যকে প্রসারিত করিয়া রাষ্ট্রের সহিত সম্পূর্ণ অসহযোগ করিবার ক্ষমতাও নিজেদের হাতে রাখিলেন। কিন্তু আমাদের পশ্চিমী অর্থের সহিত এই অমান্য শব্দের অর্থের কতোই না পার্থক্য! ইহার মধ্যে ধর্মমূলক বীরত্বের দিকটিকে কী অসাধারণ ভাবেই না প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে!

প্রতিপক্ষের প্রতি হিংসার প্রয়োগ করিতে সত্যাগ্রহীদের নিষেধ রহিয়াছে—কারণ, প্রতিপক্ষরাও যে আন্তরিক ভাবে কাজ করে, তাহা স্বীকার করিতে হইয়াছে।

---

[২৬] গান্ধীজী এই সমস্ত সমালোচনা সম্পর্কে ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই নভেম্বর 'ইয়ং ইণ্ডিয়া'তে উল্লেখ এবং আলোচনা করেন।

একজনের কাছে যাহা সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়, অপরজনের কাছে তাহা ভুল বলিয়া মনে হইতে পারে, এবং হিংসার দ্বারা কাহারও মধ্যে বিশ্বাসের উদয় সম্ভব নহে। সত্যাগ্রহীদের প্রতিপক্ষকে জয় করিতে হইবে, ভালোবাসার দ্বারা—বিশ্বাসের মধ্যে যে ভালোবাসার জন্ম হইয়াছে, তাহার দ্বারা, আত্ম-অস্বীকারের দ্বারা, যন্ত্রণাকে সাদরে সানন্দে বরণের দ্বারা। বাস্তবিক পক্ষে, ইহা এক প্রকার প্রচার, যাহার প্রতিরোধ প্রায়ই সম্ভব হয় না। এই প্রচারের ফলেই খ্রীষ্টের ক্রুশ এবং তাঁহার শিষ্যদের স্বল্পসংখ্যক একটি সম্প্রদায় বিশাল সাম্রাজ্যকেও জয় করিয়াছিল। ন্যায়ের এবং স্বাধীনতার জন্য যে সকল মানুষ আপনাদের উৎসর্গ করিতে চাহিয়াছেন, তাঁহাদের ধর্ম-প্রণোদিত উৎসাহকে প্রকাশ করিবার জন্য মহাত্মা সারা ভারতবর্ষে ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই এপ্রিল তারিখে উপাসনা এবং অনশনের দিন হিসাবে একটি হরতাল ঘোষণা করেন। ইহাই তাঁহার প্রথম কীর্তি এবং এই কীর্তিটি সমগ্র জাতির বিবেকের গভীরতম অংশকে স্পর্শ করে। ইহার একটি অপ্রত্যাশিত সুফলও দেখা যায়। এই সর্বপ্রথম, ভারতের সমস্ত শ্রেণী একটিমাত্র প্রচেষ্টায় সঙ্ঘবদ্ধ হইল। এই সর্বপ্রথম, ভারত আবিষ্কার করিল আপনাকে।

প্রায় সর্বত্রই শান্তি বিরাজ করিতেছিল। কেবল মাত্র দিল্লীতেই কিঞ্চিৎ গোলযোগ দেখা গেল।[২৭] জনসাধারণকে তাহাদের কর্তব্য বুঝাইবার জন্য গান্ধীজী দিল্লী রওনা হইলেন। কিন্তু সরকার তাঁহাকে ট্রেনে গ্রেফ্তার করিলেন এবং পুনরায় বোম্বাই পাঠাইয়া দিলেন। গান্ধীজীর গ্রেফ্তারের সংবাদ পৌঁছায় পাঞ্জাবে দাঙ্গা-হাঙ্গামা বাধিল। অমৃতশহরে লুটপাট এবং খুনখারাপিও ঘটিল। ১১ই এপ্রিল রাত্রির মধ্যে জেনারল ডায়ার তাঁহার সৈন্যসামন্ত লইয়া উপস্থিত হইলেন এবং সমস্ত শহর ঘেরাও করিলেন। সর্বত্রই শৃঙ্খলার পুনঃপ্রতিষ্ঠা হইল। ১৩ই তারিখ ছিল হিন্দুদের একটি বিরাট উৎসবের দিন। জনসাধারণ জালিয়ানওয়ালাবাগ নামক একটি স্থানে আসিয়া জড়ো হইল। জনসাধারণের মধ্যে কোনো প্রকার অশান্ত ভাব ছিল না এবং জনতার মধ্যে নারী এবং শিশুও ছিল প্রচুর। পূর্বদিন রাত্রিতে জেনারল ডায়ার সমস্ত সভা-সমিতি এবং সমাবেশ নিষিদ্ধ করিয়া দিলেন। কিন্তু এই নিষেধাজ্ঞার কথা তখনো কেহই জানিল না। জেনারল ডায়ার বহু মেশিনগান এবং সৈন্যসহ জালিয়ানওয়ালাবাগে আসিয়া পৌঁছিলেন এবং সৈন্যদের আগমনের আধঘণ্টা বাদেই কোনো প্রকার সতর্ক না করিয়াই অসহায় জনতার উপর গুলী চালাইতে লাগিলেন। গুলী-বারুদ কম না পড়া পর্যন্ত দশ মিনিট কাল ধরিয়া অবিশ্রান্ত গুলি চালানো হইল। জালিয়ানওয়ালাবাগের চারিদিকে ছিল উঁচু প্রাচীর। সুতরাং পলায়ন ছিল অসম্ভব। পাঁচ ছয় শত হিন্দু নিহত হইলেন এবং তাহার অপেক্ষাও অধিক সংখ্যক লোক হইলেন আহত। আহত এবং নিহত ব্যক্তিদের দিকে কেহ ফিরিয়াও তাকাইল না। দেশে সামরিক আইন জারী হইল।

আতঙ্কে পাঞ্জাবের হৃৎপিন্ড পর্যন্ত কাঁপিয়া উঠিল। বিমানপোত নিরস্ত্র

---

[২৭] ৩০শে মার্চ, ১৯১৯।

জনতার উপর বোমা ফেলিতে লাগিল। দেশের সর্বাপেক্ষা শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিদিগকে সামরিক আদালতে ধরিয়া আনিয়া চাবকানো হইল, হামাগুড়ি দিতে বাধ্য করা হইল এবং তাঁহাদিগকে আরো নানারূপ লাঞ্ছনা-অপমান সহিতে হইল। মনে হইল, ইংরেজ শাসক-গোষ্ঠীকে অকস্মাৎ যেন কোনো ভুলের মহামারীতে পাইয়া বসিয়াছে! যেন ভারত অহিংসার বাণী ঘোষণা করায় তাহার প্রথম ফলস্বরূপ হিংসার পূজারী ইউরোপীয় মানুষরা ক্রোধে আক্রোশে পাগল হইয়া গিয়াছে! গান্ধীজী পূর্ব হইতে ইহাই আশা করিতেছিলেন। তিনি তাঁহার স্বদেশবাসীকে রক্তহীন কণ্টকহীন পথে বিজয়-তোরণে পোঁছাইয়া দিবার অংগীকার করেন নাই। জালিয়ানওয়ালাবাগের দিনই ছিল ভারতবাসীর মন্ত্র-দীক্ষার দিন।

"পৃথিবীর অন্যান্য জাতির দ্বারা অনতিক্রম্য এক অবস্থায় পোঁছিতে হইলে ভারতকে এক সহস্র কেন, বহু সহস্র নিরপরাধ নরনারীর হত্যাকে নির্লিপ্তভাবে গ্রহণ করিতে হইবে। ফাঁসি যাওয়াকে প্রত্যেক মানুষের জীবনের দৈনন্দিন ব্যাপার বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে।"[২৮]

পাঞ্জাবের এই ভয়াবহ সংবাদ যাহাতে বাহিরে পোঁছিতে না পারে, সে ব্যবস্থাতেও সামরিক সেন্সর-বিভাগ সফল হইল।[২৯]

কিন্তু সংবাদ যখন ধীরে ধীরে আসিতে লাগিল, তখন দেশব্যাপী ক্ষোভের আর সীমা রহিল না এবং ইংল্যান্ডেও চাঞ্চল্য দেখা গেল। একটি কমিশন বসাইয়া শুরু হইল তদন্ত। এই কমিশনের সভাপতি হইলেন লর্ড হাণ্টার। জাতীয় কংগ্রেসও একটি অনুরূপ তদন্ত কমিশন বসাইলেন। অমৃতশহরে হত্যাকান্ড যাহারা ঘটাইয়াছিল, তাহাদিগকে শাস্তি দিলে সরকারের স্পষ্টত উপকারই হইত (এবং বুদ্ধিমান ইংরেজরাও তাহা জানিতেন)। কিন্তু গান্ধীজী স্বয়ং ইহা দাবি করিলেন না। প্রশংসনীয় এক সহিষ্ণুতার মনোভাবের দ্বারা চালিত হইয়া তিনি জেনারল ডায়ার বা অন্যান্য অপরাধী কর্মচারীদের শাস্তির দাবি করিতে অস্বীকার করিলেন। গান্ধীজীর মধ্যে আক্রোশ বা প্রতিশোধের কোনো স্থান ছিল না। তিনি ডায়ারকে কেবলমাত্র ভারত হইতে সরাইয়া লইতে বলিলেন।......কিন্তু তদন্ত কমিশনের কাজ শেষ হইবার আগেই ভারত-সরকার তাড়াতাড়ি এক ইন্‌ডেম্‌নিটি এ্যাক্ট পাস করিলেন এবং ইহার আওতায় সমস্ত অপরাধী কর্মচারীরা রক্ষা পাইল। অপরাধী কর্মচারীরা কেবল চাকরিতে যে বহাল রহিল, তাহাই নহে, এমন কি তাহারা পুরস্কৃতও হইল।

এই গোলযোগের মাঝখানেই আবার একটি কান্ড ঘটিল, যাহা প্রথমটির অপেক্ষাও গুরুতর। ভারত-সরকারের প্রধান ব্যক্তি কর্তৃক ভারত-সরকারের পবিত্র অঙ্গীকার নির্লজ্জভাবে ভঙ্গ করা হইল। এবং এইরূপে ইউরোপীয়ানদের প্রতি ভারতীয়দের যে-বিন্দুমাত্র বিশ্বাস তখনও অবশিষ্ট ছিল তাহাও বিনষ্ট হইল।

---

২৮ ৭ই এপ্রিল, ১৯২০।

২৯ যাহাতে বিপ্লবীরা ইহার সুযোগ লইতে না পারেন, তাই গান্ধীজী ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের ১৮ই এপ্রিল তারিখে আন্দোলন সাময়িকভাবে বন্ধ রাখেন।

ইউরোপীয় যুদ্ধ ভারতীয় মুসলমানদের নিকট বিবেকের এক কঠিন সমস্যা তুলিয়া ধরিয়াছিল। তাঁহারা উভয়-সমস্যায় পড়িয়াছিলেন। তাঁহাদের একদিকে ছিল সাম্রাজ্যের প্রতি আনুগত্য এবং অন্যদিকে তাঁহাদের ধর্ম-নেতা তুরস্কের সুলতানের প্রতি বিশ্বস্ততা। ইংল্যান্ড সুলতান বা খলিফার সার্বভৌম ক্ষমতায় হস্তক্ষেপ করিবেন না এই অঙ্গীকারেই ভারতীয় মুসলমানগণ ইংল্যান্ডের পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন। মুসলমান জনমত দাবি করিলেন যে ইউরোপীয় তুরস্ক তুর্কীদের হাতেই থাকিবে এবং তুরস্কের সুলতান ইসলামের পবিত্র স্থানগুলির উপর— মুসলমান পণ্ডিতগণের ব্যাখ্যা অনুযায়ী মেসোপটেমিয়া, সিরিয়া এবং প্যালেস্টাইন প্রভৃতি প্রদেশগুলি সহ আরবের উপর সার্বভৌম কর্তৃত্ব করিবেন। লয়েড জর্জ এবং ভারতের বড়লাট, উভয়েই এবিষয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু যুদ্ধ শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহারা প্রতিশ্রুতির কথা ভুলিয়া গেলেন। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালে ভারতীয় মুসলমানরা পরিকল্পিত শান্তি-শর্তের রূঢ়তা দেখিয়া অস্বস্তি অনুভব করিতে এবং অনুযোগ করিতে লাগিলেন। এমনিভাবে খিলাফত আন্দোলনের হইল সূত্রপাত। এই আন্দোলন ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের ১৭ই অক্টোবর তারিখে শান্তিপূর্ণ অথচ গুরুগম্ভীর বিক্ষোভ প্রদর্শনের দ্বারা আরম্ভ হয়। এবং ইহার একমাস বাদেই দিল্লীতে এক সর্ব-ভারতীয় খিলাফত সম্মিলন ঘটে। গান্ধীজী ইহার সভাপতিত্ব করেন এবং বিচক্ষণতার সহিত ইহাকে হিন্দু-মুসলমান মিলনের এক সর্বাপেক্ষা উপযোগী অস্ত্ররূপে ব্যবহার করেন। সত্যই, ইহা ছিল গুরুত্বপূর্ণ বিরাট এক সমস্যা। বৃটিশ সরকার চিরকালই হিন্দু-মুসলমানের স্বাভাবিক শত্রুতাকে উশ্‌কানি দিয়া বাড়াইয়া আসিয়াছেন এবং এই শত্রুতাকে গড়িয়া তুলিবার ব্যাপারে গান্ধীজী বৃটিশ সরকারকে বহুল পরিমাণে দায়ী করিয়াছেন। যাহাই হউক, সরকার এই বৈরিতা কমাইতে কোনো চেষ্টাই করেন নাই। এই দুইটি ধর্মও মধ্যে মধ্যে পরস্পরের সংঘর্ষে আসিয়াছে। মসজিদের সামনে যেখানে নিস্তব্ধতার প্রয়োজন, সেখানে হিন্দুরা গান গাহিয়া যান। অন্যপক্ষে মুসলমানরাও হিন্দুদিগের গো-সেবা সংক্রান্ত ব্যাপারে হিন্দুদিগের মনে পীড়া দেন। ফলে চলে অবিরাম কলহ এবং ক্রমেই গভীরতর হইতে থাকে বিভেদের ব্যবধান। এই দুইটি জাতি পরস্পরের সহিত মেলামেশা করেন না। ইঁহাদের পরস্পরের মধ্যে বিবাহ এবং একত্রে ভোজন নিষিদ্ধ। তাই ভারত-সরকার হিন্দু-মুসলমানের এই চিরন্তন কলহের উপর নির্ভর করিয়াই ঘুমাইয়া কাটান। খিলাফত সম্মিলনে গান্ধীজী যখন হিন্দু-মুসলমানের মিলন ঘোষণা করিলেন, তখন তাঁহার মন্দ্র কণ্ঠস্বর ঘুমন্ত সরকারকে আচমকা জাগাইয়া দিল। আন্তরিক মহানুভবতার সঙ্গে গান্ধীজী ঘোষণা করিলেন যে, খিলাফতের সমর্থনে মুসলমানের দাবিকে হিন্দুদিগের নিজেদের দাবি করিয়া তুলিতে হইবে।

"হিন্দু, পার্শী, খৃষ্টান, ইহুদী, আমরা যাহাই হই না কেন, আমরা যদি একটি মাত্র 'নেশন' হিসাবে বাঁচিয়া থাকিতে চাই, তবে আমাদের একজনের স্বার্থকে সকলের স্বার্থ করিয়া তুলিতে হইবে। কেবলমাত্র গুরুত্বের সহিত বিবেচনা করিতে

হইবে দাবিটি ন্যায়সঙ্গত কিনা।"

ইতিপূর্বেই অমৃতশহরের বধ্যভূমিতে হিন্দুর রক্তের সহিত মুসলমানের রক্তের মিলন ঘটিয়াছে। এখন হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যকে শক্তিশালী করিয়া তুলিতে হইবে, এবং এই ঐক্যের পিছনে কোনো শর্ত থাকিলে চলিবে না। ভারতীয় জনগণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সহনশীল অংশ হইলেন মুসলমানরা এবং তাঁহারাই সর্বপ্রথমে খিলাফত সম্মিলনে অসহযোগ সিদ্ধান্ত লইলেন। গান্ধীজী ইহার সমর্থন জানাইলেন। কিন্তু তাঁহার উদারনীতির ফলে তিনি বিলাতী মাল বর্জনের প্রতিবাদ করিলেন। কারণ, তিনি এই বর্জনের মধ্যে দেখিলেন দুর্বলতা এবং প্রতিশোধ-স্পৃহার চিহ্ন। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বরের শেষের দিকে অমৃতশহরে দ্বিতীয় বার যে খিলাফত সম্মিলন হইল, তাহাতে ইউরোপে একদল প্রতিনিধি প্রেরণ করায় এবং শান্তিস্থাপনের ব্যাপারে যদি ভারতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষাকে দলিত করা হয়, তাহার ভয়াবহ ফলাফল সম্বন্ধে বড়লাটের নিকট একটি চরমপত্র পাঠাইবার কথা স্থির হইল। ১৯২০ সালে বোম্বাইয়ের এক সম্মিলনে একটি ইস্তাহার জারী হইল। এই ইস্তাহারে করা হইল ইংরেজ রাজনীতিকদিগের বুদ্ধিহীনতার তীব্র নিন্দা এবং আসন্ন ঝটিকার সংকেত।

গান্ধীজী ঝড় আসিতে দেখিলেন; তিনি এই ঝড়কে সাদরে অভ্যর্থনা না করিয়া বরং বাধা দিয়া থামাইয়া রাখিতেই চাহিলেন। অবশেষে, ইংল্যান্ডও বিপদের কথা বুঝিল এবং সরকার ছোটখাটো সুযোগ-সুবিধা দিয়া এই ঝড়কে ঠেকাইতে চাহিলেন। মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড প্রস্তাবের উপর ভিত্তি করিয়া এক ভারতীয় সংস্কার-বিধি অনুসারে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক শাসনে ভারতের জনসাধারণকে অপেক্ষাকৃত অধিক ক্ষমতা এবং দায়িত্ব দেওয়া হইল। ১৯১৯ সালের ২৪শে তারিখের এক ঘোষণায় রাজা এই সংস্কারে সম্মতি দিলেন, জনসাধারণকে এবং কর্মচারিগণকে এই সংস্কার গ্রহণ করিতে আহ্বান করিলেন এবং বড়লাটকে রাজবন্দীদিগকে মার্জনা করিতে নির্দেশ দিলেন। সহৃদয় যে কোনো কাজই গান্ধীজীকে সহজে স্পর্শ করে। তাই তিনি এই সংস্কারগুলি গ্রহণের পরামর্শ দিলেন। এই সংস্কারগুলিকে যথেষ্ট না ভাবিলেও তিনি ভাবিলেন যে ইহাকে নূতনতর এবং বৃহত্তর এক সংস্কারের ভিত্তিরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে।

এক উত্তপ্ত আলোচনার পর ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের পরবর্তী অধিবেশনে গান্ধীজীর মতামতই সমর্থন লাভ করিল।

কিন্তু এই শেষ আশাও অন্যান্য বারের মতোই অবশেষে অপূর্ণ রহিয়া গেল। বড়লাট তো রাজবন্দীদিগকে মার্জনা করিলেনই না, বরং তাঁহাদের কয়েকজনের প্রাণদণ্ডও হইল। ইহার ফলে সমগ্র ভারত পুনরায় উত্তেজিত হইয়া উঠিল। এবং ইহা স্পষ্ট হইয়া উঠিল যে সংস্কারের প্রতিশ্রুতিগুলি কেবলমাত্র ছলনা ছাড়া আর কিছুই নহে।

এই সময় ১৯২০ সালের ১৪ই মে তারিখে তুরস্কের সহিত সন্ধির বিপজ্জনক শর্তাবলীর কথা ভারত জানিতে পারিল। বড়লাট তাঁহার এক বাণীতে ঘোষণা

করিলেন যে, যদিও এই সন্ধি মুসলমানদের নিকট বেদনাদায়ক বোধ হইবে, তথাপি তাঁহাদের কর্তব্য হইবে ইহাকে সংযম ও সহিষ্ণুতার সহিত গ্রহণ করা।

ঠিক ঐ সময়েই অমৃতশহর হত্যাকাণ্ডের তদন্ত কমিশনের সরকারী রিপোর্ট প্রকাশিত হইল এবং ইহা সমস্ত ভারতবাসীর মনে ঘৃণার উদ্রেক করিল।

পাশার চাল ঠিক হইয়া গেল, সরকারের সহিত শেষ সম্পর্কগুলিও সম্পূর্ণ ছিন্ন হইল। ১৯২০ সালের ২৮শে মে তারিখে খিলাফত কমিটি গান্ধীজীর অসহযোগের প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন। ১৯২০-র ২০শে জুন তারিখে এলাহাবাদে হিন্দু-মুসলমানের মিলিত সভা ইহাকে সর্বসম্মতিক্রমে সমর্থন জানাইলেন এবং বড়লাটকে চরম পত্রের শর্তাবলী পূরণের জন্য এক মাস সময় দিলেন। কেন তিনি অসহযোগের আশ্রয় লইলেন তাহার ব্যাখ্যা করিয়া গান্ধীজী স্বয়ং বড়লাটকে এক পত্র লিখিলেন। তাহাতে তিনি যে সমস্ত কারণ দেখাইলেন, তাহা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। কারণ, এই শেষ মুহূর্তেও তিনি ইংল্যাণ্ডের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিতে চান নাই। তাই সাধারণ সংস্কারের পন্থা অবলম্বন করিয়াই তিনি ইংল্যাণ্ডকে অনুতপ্ত দেখিতে আশা করিলেন।

"এখন, আমার ন্যায় যে-কোনো ব্যক্তির নিকট একটিমাত্র পন্থা গ্রহণের সুযোগ অবশিষ্ট রহিয়াছে, এবং তাহা হইল বৃটিশ শাসনের সহিত সকল সম্পর্ক ছিন্ন করা। অন্যথা, এখনো যদি আমি প্রচলিত অন্যান্য গঠনতন্ত্রের অপেক্ষা বৃটিশ গঠনতন্ত্রের সহজাত শ্রেষ্ঠতা সম্পর্কে বিশ্বাস রাখি, তবে এমন ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত যাহার ফলে কৃত অন্যায়ের সংশোধন ঘটিবে এবং হৃত বিশ্বাস পুনরায় ফিরিয়া আসিবে। আমি এই শ্রেষ্ঠতায় বিশ্বাস হারাই নাই এবং এই কারণেই আমি আইন অমান্যের পথ গ্রহণ করিতে পরামর্শ দিয়াছি।"

ইহা হইতেই বুঝা যায়, ইংল্যাণ্ড তাহার অন্ধ দম্ভের ফলে তাহার সাম্রাজ্যের কতো বড়ো একজন নাগরিককে হারাইয়া ফেলিয়াছে!

দ্বিতীয় অধ্যায়

১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে জুলাই তারিখে গান্ধীজী ভারতের নিকট ঘোষণা করিলেন যে, ১লা আগস্ট তারিখ হইতে অসহযোগ আন্দোলন সুরু হইবে। তিনি জনসাধারণকে ঐ তারিখের পূর্বদিন (১৯২০ সালের ৩১ জুলাই) উপাসনা ও অনশনের দ্বারা প্রস্তুতির পবিত্র হরতাল পালন করিতেও পরামর্শ দিলেন। সরকারের ক্রোধের প্রতি তিনি বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ করিলেন না। বরং জনতার আক্রোশ সম্বন্ধেই ভয় পাইতে লাগিলেন। তাই জনসাধারণের মধ্যে যাহাতে নিয়ম ও শৃঙ্খলা বজায় থাকে, তাহার জন্য পূর্ব হইতেই তিনি ব্যবস্থা অবলম্বন করিলেন।

"অসহযোগের সাফল্য নির্ভর করে পরিপূর্ণ সংগঠনের উপর। ক্রোধ হইতে আসে বিশৃঙ্খলা। বিন্দুমাত্রও হিংসার অস্তিত্ব থাকিলে চলিবে না। প্রতিটি হিংসার

অর্থ হইল পিছনে হটিয়া আসা, নিরপরাধ জীবনের অনর্থক অপচয় করা... সর্বোপরি, দেশের সর্বত্রই শৃঙ্খলা রক্ষা করিয়া চলিতে হইবে।"

পূর্ববর্তী দুই মাসকাল ধরিয়া ইতিমধ্যে গান্ধীজী এবং অসহযোগ কমিটি কর্তৃক অসহযোগ কর্মতালিকা প্রস্তুত হইয়া গিয়াছিল। তাহাতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :

(১) খেতাব এবং অবৈতনিক চাকরি ত্যাগ করিতে হইবে।

(২) সরকারী ঋণের ব্যাপারে অংশগ্রহণ চলিবে না।

(৩) আইনজীবীদিগকে সাময়িকভাবে ওকালতি বন্ধ রাখিতে হইবে; এবং সালিসির দ্বারা দেওয়ানী মামলার মীমাংসা করিতে হইবে।

(৪) পিতামাতাদিগকে সরকারী স্কুল বয়কট করিতে হইবে।

(৫) সংস্কার অনুযায়ী যে কাউনসিল গঠিত হইয়াছে, তাহাও বর্জন করিতে হইবে।

(৬) সরকারী ভোজসভায় বা জলসায় অংশগ্রহণ চলিবে না।

(৭) সামরিক বা অসামরিক যে-কোনও চাকরি গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিতে হইবে।

(৮) স্বদেশীর প্রচার করিতে হইবে।

ইহা প্রথম সোপান মাত্র। এই অসাধারণ বিচক্ষণ মানুষটি, যিনি ভারতীয় বিদ্রোহের এই বিপুল যন্ত্রকে গতিশীল করিয়াছেন, তিনি সত্যিই লক্ষণীয় এবং ইউরোপীয় বিপ্লবীদের নিকট নিঃসন্দেহে বিস্ময়ের বস্তু। এখানে "আইন-অমান্যের" কোনো প্রশ্নই ছিল না। আইন-অমান্যের স্বরূপ গান্ধীজী ভালো করিয়াই জানিতেন। থরোর রচনায় এ বিষয় তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে পাঠ করিয়াছিলেন। তিনি থরোর রচনা হইতে বহু অংশ তাঁহার প্রবন্ধগুলিতে উদ্ধৃতও করিয়াছেন। আইন-অমান্য হইতে অসহযোগকে তিনি বিশেষ সাবধানতার সহিত পৃথক করিয়া দেখাইয়াছেন। আইন-অমান্য হইল মানিতে অস্বীকার, কোনো আইনকে বস্তুত ভঙ্গ করা। "এই আইনভঙ্গের রীতি কেবলমাত্র কয়েকজন বিশিষ্ট মানুষের দ্বারাই কার্যত প্রয়োগ সম্ভব; অথচ অন্যপক্ষে, অসহযোগ হইল গণ-আন্দোলন। এবং ইহা গণ-আন্দোলনই হওয়া উচিত।" অবশ্য গান্ধীজী ভারতের জনসাধারণকে "আইন-অমান্যের" জন্যই প্রস্তুত করিতেছিলেন। তবে তাহা ধাপে ধাপে, ধীরে ধীরে। তিনি জানিতেন যে ভারতবাসী তখনো যথেষ্ট প্রস্তুত হয় নাই এবং যতক্ষণ না তিনি জানিতে পারিতেছিলেন যে জনসাধারণ প্রয়োজনের অনুরূপ আত্মসংযমের অধিকারী হইয়াছে, ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি তাহাদের বল্গা আলগা করাও পছন্দ করিতেন না। অসহযোগের এই প্রথম কর্মসূচীতে ট্যাক্স-বন্ধের কোনো প্রশ্নই ছিল না। গান্ধীজী উপযুক্ত সময়ের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন।

১লা আগস্ট তারিখে তিনি বড়লাটের নিকট প্রেরিত তাঁহার এক বিখ্যাত পত্রে আন্দোলনের সংকেত করিলেন। এই পত্রের সহিত গান্ধীজী তাঁহার খেতাব এবং পদকগুলিও ফেরত পাঠাইলেন।

"আপনার পূর্ববর্তী বড়লাট বাহাদুর আমাকে দক্ষিণ আফ্রিকায় মানবহিতৈষী কার্যের জন্য যে 'কাইজার-ই-হিন্দ্' স্বর্ণ-পদক দিয়াছিলেন, জুলু যুদ্ধের সময় দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয় স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর কর্মচারী হিসাবে আমি যে পদক পাইয়াছিলাম এবং বুয়র যুদ্ধের সময় স্ট্রেচার-বাহক বাহিনীর সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হিসাবে কার্যের জন্য আমি যে পদক পাইয়াছিলাম, সেগুলি সমস্তই ফেরত পাঠাইতেছি। ইহাতে যে আমি আদৌ ব্যথিত হই নাই, এমন নহে।" অতঃপর গান্ধীজী অমৃতশহরের ঘটনাবলী এবং খিলাফত আন্দোলনের মূল কারণগুলির উল্লেখ করিয়া বলেন, "কিন্তু যে সরকার এইরূপ দুর্নীতি ও অন্যায়ের কালিমায় কলঙ্কিত, তাহার প্রতি আমি আর বিন্দুমাত্র সম্মান বা স্নেহকে প্রশ্রয় দিতে পারি না।...আজ এই সরকারকে তাহার সকল ভুলত্রুটি সংশোধন করাইবার প্রয়োজন হইয়াছে।" জনসাধারণের সহিত পরামর্শ করিয়া বড়লাট সকল অতীত অন্যায় এবং অবিচারের ক্ষতিপূরণ করিবেন, গান্ধীজী এমন আশাও এই পত্রে প্রকাশ করেন।

অবিলম্বে গান্ধীজীর দৃষ্টান্ত ভারতের সর্বত্রই অনুসৃত হইতে লাগিল। শত শত আইনজীবী এবং বিচার-বিভাগের কর্মচারী পদত্যাগপত্র দাখিল করিলেন। হাজারে হাজারে ছাত্রেরা কলেজ ত্যাগ করিল। আদালতগুলি বয়কট হইল। স্কুলগুলি জনশূন্য পড়িয়া রহিল। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস কলিকাতায় এক বিশেষ অধিবেশনে বিপুল ভোটাধিক্যে গান্ধীজীর সিদ্ধান্তের সমর্থন করিলেন। গান্ধীজী এবং তাঁহার বন্ধু মওলানা শওকত আলি বিপুল সমারোহের সহিত সমগ্র দেশময় ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। এই সংগ্রামের প্রথম কয়েক মাসে গান্ধীজী নেতৃত্বের যে ক্ষমতা দেখাইলেন, তাহা ইতিপূর্বে আর কখনো দেখান নাই! হিংসাকে সংযত করিয়া রাখিতে হইল। জনতার শৃঙ্খলাহীন হিংসাত্মক কার্যকে তাঁহার চিরকালই ভয়। তিনি তীব্র ভাবে 'জনতাতন্ত্রের' নিন্দা করিলেন। এই জনতাতন্ত্রকেই তিনি ভারতের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ বিপদ বলিয়া ভাবেন। যুদ্ধকে তিনি যেমন ঘৃণা করেন, তেমন আর কেহই করেন না। তবু যদি তাঁহাকে বাছিয়া লইতে বলা হয়, তবে তিনি এই জনতা-দৈত্যকে বন্ধন-মুক্ত করিবার অপেক্ষা যুদ্ধকেই শ্রেয় বলিয়া গ্রহণ করিবেন। "ভারতকে যদি হিংসার দ্বারা স্বাধীনতা লাভ করিতে হয়, তবে তাহাকে শৃঙ্খলা এবং সম্মানজনক হিংসার দ্বারাই করিতে হইবে। জনতার শাসন আমরা কোনো মতেই গ্রহণ করিব না।"

"এমন কি আনন্দিত প্রাণোৎফুল্ল শোভাযাত্রাও যে-কোনো মুহূর্তে বীভৎস উন্মত্ততায় পরিণত হইতে পারে।[৩০] এই অনিয়মের মধ্য হইতে নিয়মকে গড়িয়া তুলিতে হইবে। বিশৃঙ্খল জনতার শাসনের স্থানে আনিতে হইবে জনসাধারণের বিধিকে।" তাই গান্ধীজী জনসাধারণের এই বিক্ষোভের ধারাকে উপযুক্ত পথে পরিচালিত করার জন্যে বহু নিয়মকানুনের প্রবর্তন করিলেন।

---

৩০ ৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯২০।

"আমাদের অন্যতম মারাত্মক ত্রুটি এই যে আমরা সংগীতকে অবহেলা করিয়াছি। সংগীতের অর্থ হইল ছন্দ, শৃঙ্খলা। বৈদ্যুতিকের মতো ইহার শক্তি। কিন্তু দুঃখের বিষয় সংগীত মুষ্টিমেয়ের করতলগত হইয়াছে। ইহার জাতীয়করণ ঘটে নাই। জনপ্রিয় গীতিগুলিকে দলবদ্ধভাবে এবং উপযুক্তভাবে গাওয়াকে আমি আবশ্যিক করিয়া তুলিতে চাই। এবং এই উদ্দেশ্যে আমি চাই যে, দেশের বড়ো বড়ো সাংগীতিকেরা কংগ্রেসের প্রত্যেক অধিবেশনে, এবং প্রত্যেক সম্মেলনে যোগ দিবেন এবং জনসাধারণের সংগীত সকলকেই শিখাইবেন।"

অতঃপর পরিচালনার বিষয়ে কতকগুলি নিয়মের তালিকাও রহিয়াছে :

"(১) বিরাট কোনো সভা ও শোভাযাত্রার জন্য নূতন স্বেচ্ছাসেবক গ্রহণ করা উচিত হইবে না। সুতরাং অত্যন্ত অভিজ্ঞ স্বেচ্ছাসেবক ভিন্ন কেহই নেতৃত্বের সুযোগ পাইবে না। (২) স্বেচ্ছাসেবকদের প্রত্যেকের সঙ্গে একটি করিয়া সাধারণ নির্দেশের তালিকাও থাকিবে। (৩) স্বেচ্ছাসেবককে সম্পূর্ণরূপে মানিয়া চলিবার জন্যে জনতাকে নির্দেশ দিতে হইবে। (৪) কোন্ কোন্ জাতীয় ধ্বনি তুলিতে হইবে এবং কখন তুলিতে হইবে তাহাও স্বেচ্ছাসেবকগণই স্থির করিয়া দিবেন। (৫) সদর রাস্তাগুলিতে ভীড় জমিতে দেওয়া উচিত হইবে না। রেলওয়ে স্টেশন-গুলিতেও যাহাতে ভীড় না জমে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।"

অর্থাৎ, এককথায়, গান্ধীজী নিজেকে এই অসংখ্য মানুষের বিপুল ঐকতানের প্রধান নির্দেশক করিয়া তুলিলেন।

"জাতির সর্বাপেক্ষা কঠিন কর্তব্য হইল শোভাযাত্রা এবং বিক্ষোভ-প্রদর্শনগুলিকে সুশৃঙ্খল করিয়া তোলা।"[৩১]

বিশৃঙ্খল জনতা কেবল থাকিয়া থাকিয়াই হিংসার আশ্রয় গ্রহণ করে, উন্মত্ত হইয়া উঠে এবং অকস্মাৎ অভিভূত হইয়া পড়ে। একদল হিন্দু আছেন, যাঁহারা হয় গান্ধীজীর নীতির স্বরূপটি, নয়, এই নীতির রাজনীতিক উপযোগিতাটি ধরিতে পারেন নাই। তাঁহারা হিংসার আশ্রয় লইতে বলেন। গান্ধীজী যাহাতে হিংসার বিরোধিতা না করেন, সেজন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিয়া তাঁহার নিকট বহু বেনামী পত্রও আসে। এই পত্রগুলিতে (এগুলি কী উদ্ধত এবং অপমানকর!) বলা হয় যে গান্ধীজীর কথাগুলি তাঁহার শত্রুকে প্রতারণা করিবার ছল মাত্র। এবং এই পত্রের লেখকরা তাঁহার নিকট যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবার সংকেতও দাবি করেন। গান্ধীজী তীব্রভাবেই এই পত্রগুলির জবাব দিয়াছেন। তিনি তিনটি সুন্দর প্রবন্ধে "অসির নীতিকে" অপ্রমাণ করিয়া দেখান। হিন্দুর শাস্ত্র কিংবা কোরান কোথাও হিংসার শিক্ষা দিয়াছে, ইহা তিনি অস্বীকার করেন। হিংসা কখনো কোনো ধর্মের সূত্র হইতে পারে না। যিশুকে তো নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের রাজপুত্র বলা যাইতে পারে। ভগবৎ-গীতাও হিংসার শিক্ষা দেয় না, কেবল শিক্ষা দেয় নিজের জীবনকে

---

[৩১] ৮ই ও ২৪শে সেপ্টেম্বর এবং ২০শে অক্টোবর ১৯২০।

বিপন্ন করিয়াও কর্তব্য করিবার।[৩২] মানুষের হাতে সৃষ্টির ক্ষমতা নাই।...... তবে কেমন করিয়া তাহার ধ্বংসের অধিকার থাকে? এমন কি শত্রুকেও আমাদের ভালোবাসিতে হইবে। অবশ্য, ইহা হইতে এই অর্থ হয় না যে, পাপকে মানিয়া লইতে হইবে। জেনারেল ডায়ার যদি অসুস্থ হইয়া পড়েন, তবে তাঁহার শুশ্রূষা করিতে গান্ধীজী প্রস্তুত। কিন্তু তাঁহার নিজের পুত্রও যদি এমনভাবে জীবন যাপন করেন, যাহা লজ্জাজনক, তবে গান্ধীজীর ভালোবাসা পুত্রের মৃত্যুর আশঙ্কা সত্ত্বেও পুত্রকে সকল সাহায্য হইতে বঞ্চিত করিবে। বলপ্রয়োগে পাপকে পরাভূত করিবার আমাদের কোনো অধিকার নাই। সকল বিপদ তুচ্ছ করিয়া পাপের সংসর্গ-ত্যাগের দ্বারাই আমাদের পাপের প্রতিরোধ করিতে হইবে। এবং শত্রুর মধ্যে যখন অনুতাপের লক্ষণ দেখা যাইবে, তখনই তাহাকে সস্নেহে বুকে জড়াইবার জন্য দুই হাত মেলিয়া ধরিতে হইবে।[৩৩]

এই সঙ্গে গান্ধীজী দুর্বলকে, সন্দিগ্ধকে উৎসাহ দিতেও সক্ষম। প্রত্যক্ষ সংগ্রামের সম্মুখ হইতে যাহারা পলায় বা ভয় পায় গান্ধীজী যুক্তির দ্বারা তাহাদিগকে সাহসী করিয়া তোলেন।

"এই পৃথিবীতে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম ছাড়া কিছুই সফল হয় নাই। 'নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ,' এই কথাগুলিকে আমি যথেষ্ট নহে বলিয়া বাতিল করিয়া দিয়াছি... প্রত্যক্ষ সংগ্রামের দ্বারাই জেনারেল স্মাটসের মধ্যে পরিবর্তন সংঘটিত করা সম্ভব হইয়াছিল। খ্রীষ্ট এবং বুদ্ধ, ইঁহারাও জীবনের মধ্যে কিসের সুন্দরতম সমন্বয় দেখিয়াছিলেন? শক্তির এবং স্নেহের। বুদ্ধ তাঁহার সংগ্রাম শত্রুর শিবিরেও সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছেন। ফলে, ব্রাহ্মণের আধিপত্য মাথা নত করিয়াছিল। মন্দিরে যাহারা বেসাতি করিতেছিল, খ্রীষ্ট তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিলেন, নিন্দা করিলেন ফেরিসীদের, নিন্দা করিলেন ভণ্ডামির।......ইহাই হইল প্রত্যক্ষ সংগ্রামের নিবিড়তম রূপ। ইঁহাদের প্রত্যেকের সংগ্রামের পশ্চাতে ছিল অপার করুণা।"

ইংরেজদের[৩৪] হৃদয় এবং যুক্তির কাছেও আবেদন করিতে হইবে। ইংরেজদের তিনি তাঁহার "প্রিয় বন্ধু" বলিয়াই অভিহিত করেন; তিনি তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেন যে, তিনি ত্রিশ বৎসর ধরিয়া তাঁহাদের বিশ্বস্ত সহচরই ছিলেন। তিনি অনুরোধ জানান, ইংরেজরা যেন তাঁহাদের সরকারের বিশ্বাসঘাতকতার সংশোধন করিয়া লন।

"সরকারের বিশ্বাসঘাতকতা সরকারের প্রতি আমার সকল বিশ্বাস ভাঙিয়া দিয়াছে। কিন্তু বৃটিশের সৎসাহসের উপর আমার বিশ্বাস এখনো রহিয়াছে। ভারতবর্ষ এখন কেবল মানসিক বলই দেখাইতে পারে। দেখাইতে পারে অসহযোগ আত্মত্যাগ। আমি

---

[৩২] অন্ততপক্ষে ইহাই গান্ধীজীর ব্যাখ্যা। তিনি ভগবৎ-গীতার মধ্যে হিংসার ফলভোগ বা কার্যের প্রতি ঔদাসীন্য দেখিয়াছেন, এমন কথা কি কোনো ইউরোপীয়ান বলিতে সাহস পাইবেন?

[৩৩] ২৫শে আগস্ট, ১৯২০।

[৩৪] ২৭শে অক্টোবর, ১৯২০।

যন্ত্রণা সহিয়াই আপনাদের জয় করিতে পারি।"

গত চার-পাঁচ মাস কাল ধরিয়া গান্ধীজীর লক্ষ্য যে কেবল মাত্র অসহযোগের দ্বারা বৃটিশ গভর্নমেণ্টকে অচল করিয়া দেওয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, তাহা নহে। তিনি সেই সঙ্গে এক নূতন ভারতবর্ষ গড়িয়া তুলিতেও চেষ্টা করিতেছিলেন—যে ভারতবর্ষ আদর্শ এবং বস্তু-সম্পদ, উভয় দিক হইতেই নিজের প্রাচুর্যে বাঁচিয়া থাকিতে পারিবে, যাহার নিজস্ব কর্মজগৎ হইয়া উঠিবে স্বতন্ত্র, স্বাধীন। ইহার প্রথম সোপান ছিল ভারতবর্ষকে অর্থনীতির দিক হইতে আত্মনির্ভরশীল করা। গান্ধীজীর নিকট ইহার নাম 'স্বদেশী'। কিংবা, বলা যাইতে পারে, ইহাই হইল এই শব্দের সর্বাপেক্ষা প্রাথমিক এবং ব্যবহারিক অর্থ।

স্পষ্টত ইহার ফলে, ভারতকে বহু বস্তু-স্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জন দিতে শিখিতে ও বহু ত্যাগকে স্বীকার করিয়া লইতে হইল। এই স্বাস্থ্যকর সংযম ভারতের পক্ষে অপরিহার্য হইয়া উঠিল। ইহার ফলে উপকৃত হইল জাতির স্বাস্থ্য এবং নৈতিক নিয়মাবলী। সর্বাগ্রে ভারতকে "বোতলের বাতিক" হইতে মুক্ত করিবার প্রয়োজন ছিল। সুতরাং এই উদ্দেশ্যে বহুসংখ্যক পানবিরোধী দল গড়িয়া তোলা, বিলাতী মদ বয়কট করা এবং মদ্যবিক্রেতাদিগকে উপরোধ-অনুরোধের দ্বারা লাইসেন্স ত্যাগ করিতে বাধ্য করা দরকার হইয়া পড়িল।[৩৫] সমগ্র ভারতবর্ষ মহাত্মার এই আহ্বানের অর্থ বুঝিল এবং সাড়া দিল। দেশময় বহিয়া গেল পানবিরোধের তরঙ্গ। উন্মত্ত জনতা যাহাতে বলপ্রয়োগের দ্বারা মদের দোকানগুলি বন্ধ না করে, সেজন্যও গান্ধীজীকে নিজেকে বহু স্থলে হস্তক্ষেপ করিতে হইল। বলপ্রয়োগের দ্বারা মানুষকে পবিত্র করিবার অধিকার কাহারো নাই।

মদ্যপানের ব্যাধিকে অপেক্ষাকৃত সহজে বিতাড়িত করিতে পারিলেও, অর্থনীতির দিক হইতে ভারতকে আত্মনির্ভরশীল করিয়া তোলা ততো সহজ ছিল না। তাহার নিজের অন্ন কোথায়? বিলাতী মাল যদি সে বর্জন করে, তবে তাহার পরিধানের বস্ত্র কোথায়? এ বিষয়ে গান্ধীজী যে ব্যবস্থা দিলেন, তাহা অতীব সরল এবং ইহার মধ্যেই গান্ধীজীর মধ্যযুগীয় বিধিব্যবস্থার প্রতি প্রীতিটা প্রকট হইয়া উঠিল। চরকার পুরাতন গৃহশিল্পকে পুনরায় ভারতের গৃহে গৃহে প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে, ইহাই তিনি দাবি করিলেন।

সামাজিক সমস্যার এই মধ্যযুগীয় সমাধানটি বহু ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের বস্তু হইয়া উঠিল।[৩৬] কিন্তু ভারতের বিশেষ অবস্থা, এবং গান্ধীজীর কথার আসল তাৎপর্য

---

৩৫ গান্ধীজী তাঁহার পত্রে বনিয়াদী ব্যবসায়ী পাশীদিগকে দোকানপাট বন্ধ করিতে অনুরোধ করিলেন। নরমপন্থীদের নিকটে এক পত্রে তিনি জানাইলেন যে, তাঁহারা যদি তাঁহার কর্মসূচীর বাকীটুকুর সহিত একমত না হন, তাহা হইলেও যেন তাঁহারা এই পান-বিরোধের প্রচেষ্টায় সহযোগিতা করেন। এই সঙ্গে গান্ধীজী আফিম বা উত্তেজক ঔষধ বিক্রয়েরও বিরোধিতা করিতে লাগিলেন।

৩৬ গান্ধীজী নিজেও জানিতেন যে তাঁহাকে ঠাট্টা-পরিহাসের সম্মুখীন হইতে হইবে। তথাপি তিনি বলিলেন, বর্তমানেও চরকা তাহার ব্যবহারিকতার বিন্দুমাত্র হারায় নাই। বস্তুত, ইহা একটি জাতীয় প্রয়োজন—কোটি কোটি ক্ষুধিত মানুষের একমাত্র আশ্রয়।

গান্ধীজীর এই ব্যবস্থাকে সার্থক করিয়া তুলিল। কেবলমাত্র অত্যন্ত দরিদ্রের পক্ষে ভিন্ন চরকার দ্বারা কাহারো জীবিকার সংস্থান হইবে, এমন দাবি গান্ধীজী কখনো করেন নাই। তিনি কেবল বলিয়াছেন যে, সুতা-কাটাকে গৌণ-শিল্প হিসাবে গ্রহণ করিতে হইবে এবং যখন কৃষিকার্য সাময়িকভাবে বন্ধ থাকে, তখনই ইহার আশ্রয় লওয়া চলিবে। এই সমস্যাটি কেবলমাত্র কেতাবী সমস্যা নহে, ইহা যেমন তীব্র, তেমনি জরুরি। ভারতের শতকরা আশি ভাগ মানুষ কৃষিজীবী। বৎসরের চার মাস কাল তাহারা বেকার থাকে এবং জনসংখ্যার এক-দশমাংশের সাধারণত অন্নই জুটে না। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় থাকে অর্ধাহারে। ইংল্যান্ড দেশের এই দুরবস্থার কিছু সুব্যবস্থা তো করেই নাই, বরং ইহাকে তাহারা আরো বাড়াইয়া দিয়াছে। ইংরেজ কোম্পানিগুলি স্থানীয় শিল্পকলকারখানার সর্বনাশ করিয়াছে এবং প্রতি বৎসরে ৬ কোটি টাকা শোষণ করিতেছে। এই দেশ হইতে যেখানে দেশের প্রয়োজনের অনুরূপ তুলা জন্মে, অধিকাংশ তুলাই জাপানে কিংবা ল্যাংকশায়ারে রফতানি হইতেছে। এই তুলাই আবার জাপান ও ল্যাংকশায়ার হইতে ফিরিয়া আসে তৈয়ারী কাপড়ের আকারে। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, ভারতীয়দের এখন কর্তব্য বিদেশীয়দের এই সর্বনাশা সাহায্য না লইতে শেখা এবং ভারতেই কলকারখানা গড়িয়া তোলা। ভারতের প্রত্যেকটি মানুষের জন্য অন্নবস্ত্রের নিশ্চিন্ত ব্যবস্থা করিবার সময় আসিয়াছে। এই উদ্দেশ্যকে সফল করিয়া তুলিতে হইলে হিন্দুদের পুরাতন কুটির-শিল্প বয়ন ছাড়া আর কোনো প্রকার সহজ বা সস্তার উপায় নাই। কৃষকশ্রেণীর কাজে বাধা ঘটাইলে চলিবে না। কিন্তু একদিকে যেমন বেকার এবং ভবঘুরে, অন্যদিকে তেমনি শিশু এবং নারী এই বয়নের শিল্পে আত্মনিয়োগ করিতে পারিবে। তাহা ছাড়া, সমস্ত ভারতীয়ই তাঁহাদের অবকাশটুকুকে এই কাজে লাগাইতে পারেন। গান্ধীজী নিম্নলিখিত নিয়মগুলির প্রবর্তন করিলেন :

(১) বিলাতী বস্ত্রের বয়কট,

(২) সুতা কাটার পুনঃপ্রবর্তন এবং প্রচার,

(৩) কেবলমাত্র খদ্দর পরিবার শপথ গ্রহণ।

এই কার্যে গান্ধীজী অক্লান্ত উৎসাহের সহিত আত্মনিয়োগ করিলেন। তিনি দেখিলেন, সুতা কাটা[৩৭] সমস্ত ভারতবর্ষে কর্তব্য হিসাবে গৃহীত হইবে, বিদ্যালয়ে ইহার শিক্ষা দেওয়া হইবে, নিজেদের কাটা সুতা দিয়া গরীব ছেলেমেয়েরা স্কুলের মাহিনা দিতে পারিবে, এবং নরনারী প্রত্যেকে প্রতিদিন তাঁহাদের অবকাশের একঘন্টা কাল এই কাজে নিয়োগ করিবেন। তিনি তুলা, সুতা, এবং বয়ন প্রভৃতি নানা ব্যাপার সম্পর্কে তন্তুবায়, ক্রেতা, পিতা-মাতা এবং ছাত্রছাত্রীদিগকে বহু উপদেশ-পরামর্শও দিলেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, কেমন করিয়া স্বদেশী দোকান খোলা চলে, তাহাও তিনি বুঝাইলেন। অতি সামান্য মাত্র মূলধন লইয়া, শতকরা দশটাকা মাত্র মুনাফা করিয়া, ইত্যাদি। ভারতের পুরাতনতম গান হইল চরকার গান। ইহা

---

[৩৭] ২রা ফেব্রুয়ারি, ১৯২১।

শুনিয়া কবি-তন্তুবায় পুলকিত হইয়া উঠিতেন; সম্রাট ঔরংজেব বুনিয়া লইতেন তাঁহার নিজের মাথার টুপি; এই সকল কথা গান্ধীজী যখন বর্ণনা করেন, তখন তিনি ভাবে বিহ্বল হইয়া পড়েন।

এ বিষয়ে জনসাধারণকে উৎসাহিত করিতে গান্ধীজী সমর্থ হইলেন। বোম্বাই-এর সম্ভ্রান্ত মহিলারা সকলে সুতা কাটা আরম্ভ করিলেন। হিন্দু এবং মুসলমান, সকল সম্প্রদায়ের মেয়েরাই এই জাতীয় কাপড় পরিতে সম্মত হইলেন। কেবল তাহাই নহে, ইহাই ফ্যাশানে পরিণত হইল। রবীন্দ্রনাথও এই খদ্দর বা খাদির প্রশংসা করিলেন, ইহাকে তিনি সুরুচিসম্মত বলিলেন। ফরমাসের পর ফরমাস আসিতে লাগিল। এমন কি, আদেন ও বেলুচিস্তান হইতেও ফরমাস আসিল।

কিন্তু যখন স্বদেশীর ভক্তরা বিলাতী মাল বয়কট করিল, তখন তাহারা একটু বাড়াবাড়ি করিয়া বসিল। এমন কি গান্ধীজী, যিনি স্বভাবত প্রকৃতিস্থ এবং অবিচলিত থাকেন, তিনিও ভাবাতিশয্যে দিক্‌বিদিক জ্ঞান হারাইলেন। ১৯২১ সালের আগস্ট মাসে তিনি বোম্বাই-এ সমস্ত বিলাতী মাল পুড়াইয়া ফেলিতে হুকুম দিলেন। সাভোনারোলার যুগে ফ্লোরেন্সে যেমনটি হইয়াছিল, তেমনিভাবে সম্ভ্রান্তপরিবারের বংশ-পরম্পরায় ব্যবহৃত বহুমূল্য দ্রব্যাদি রাশীকৃত করিয়া তাহাতে আগুন দেওয়া হইল এবং এই বহ্ন্যুৎসবের চারিদিকে উন্মত্ত জনতা উল্লাসে তান্ডব করিতে লাগিল। এ সম্বন্ধে ভারতস্থ সর্বাপেক্ষা উদারমনা ইংরেজদের মধ্যে অন্যতম, এবং রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ বন্ধু সি. এফ. এণ্ড্রিউজ্ গান্ধীজীকে এক পত্র লেখেন। এই পত্রে তিনি গান্ধীজীর প্রতি তাঁহার অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া বহুমূল্য দ্রব্যাদি গরীবদিগকে না দিয়া পোড়াইয়া ফেলা হইল বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করেন। এই সঙ্গে তিনি আরো বলিলেন যে ধ্বংসাত্মক কার্যের ফলে জনতার মধ্যে কুপ্রবৃত্তিগুলি সহজেই জাগিয়া উঠে, ইহাই তাঁহার বিশ্বাস। যে জাতীয়তাবাদের প্রকাশের ফলে ধ্বংসকে বস্তুত ধর্মের নীতিতে পরিণত করা হয়, তাহারও তিনি নিন্দা করিলেন। মানুষের শ্রমের ফসলকে ধ্বংস করা যে মহাপাপ, ইহা এণ্ড্রিউজ কোনোমতেই না ভাবিয়া পারিলেন না। তিনি গান্ধীজীর অভিযানের সমর্থন করিয়াছিলেন। এমন কি, খদ্দরও পরিতেছিলেন। কিন্তু এখন এই সমর্থন আর সংগত হইবে কি না, তাহা ভাবিয়া তিনি বিব্রত হইয়া পড়িলেন। বোম্বাইয়ে কাপড় পোড়ানোর ব্যাপারটি গান্ধীজীর প্রতি এণ্ড্রিউজের অগাধ বিশ্বাসকে টলাইয়া দিল।

'ইয়ং ইণ্ডিয়া' পত্রিকায় এণ্ড্রিউজের পত্র প্রকাশ করিয়া গান্ধীজী জানাইলেন যে তিনি এজন্যে অনুতাপ করেন না। কোনো জাতির প্রতিই তাঁহার বিন্দুমাত্রও বিদ্বেষ নাই, এবং সমস্ত বিদেশী মালকেও তিনি ধ্বংস করিতে চান নাই। যে সকল মাল ভারতের অনিষ্ট করিবে, তিনি কেবল সেগুলিকেই নষ্ট করিতে চাহিয়াছেন। ইংরেজের কারখানাগুলি কোটি কোটি ভারতবাসীর সর্বনাশ করিয়াছে। এই সকল কলকারখানা ভারত হইতে কর্মের ক্ষেত্র অপসারিত করিয়া ভারতের হাজার হাজার মানুষকে করিয়া তুলিয়াছে অস্পৃশ্য এবং গোলাম; তাহাদের স্ত্রী-কন্যাদের করিয়া তুলিয়াছে পণ্যা। বৃটিশ শাসকদিগকে ভারতবর্ষ ইতিপূর্বেই ঘৃণা করিতে শুরু

করিয়াছিল। গান্ধীজী তাহাদের ঘৃণাকে বাড়াইয়া তুলিতে চান নাই! বরং, তিনি তাহাকে অন্য দিকে সরাইয়া দিয়াছেন। জনসাধারণের লক্ষ্যকে ইংরেজদের উপর হইতে ইংরেজী দ্রব্যের দিকে ফিরাইয়া দিয়াছেন—মানুষ হইতে মালে। ইংল্যাণ্ডের প্রতি ঘৃণা প্রকাশের জন্যে মালগুলি পোড়ানো হয় নাই। ভারত যে তাহার অতীতের সহিত সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছে, তাহারই সংকেত হিসাবে পোড়ানো হইয়াছিল এগুলিকে। এই সার্জিক্যাল অপারেশনের প্রয়োজনও ছিল। এই বিষাক্ত জিনিসগুলি গরীব-দুঃখীকে দিলে ভুল হইত। কারণ তাহাদেরও আত্ম-সম্মানের জ্ঞান আছে।

সর্বপ্রথমে ভারতের অর্থনীতিক জীবনকে বিদেশীর আধিপত্য হইতে মুক্ত করিতে হইবে। কিন্তু তাহার পরেই মুক্ত করিয়া তুলিতে হইবে ভারতীয় মনকে, গড়িয়া তুলিতে হইবে এক সত্যিকারের স্বাধীন ভারতীয় মনোভাব। গান্ধীজী চান যে, তাঁহার দেশের জনসাধারণ ইউরোপীয় সংস্কৃতির কবল হইতে মুক্ত হউক। সত্যিকার ভারতীয় শিক্ষার গোড়াপত্তন করাই গান্ধীজীর সর্বাপেক্ষা গৌরবময় সাফল্যগুলির অন্যতম।

ইংরেজ শাসনের ফলে এসিয়াটিক সংস্কৃতির ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নি বিভিন্ন স্কুলে কলেজে যেন নিদ্রাচ্ছন্ন হইয়াছিল। পঁয়তাল্লিশ বৎসরেরও অধিক কাল ধরিয়া আলিগড় ছিল ভারতে ইসলাম সংস্কৃতির কেন্দ্র, ভারতীয় মোসলেম বিশ্ববিদ্যালয়। শিখ সংস্কৃতির কেন্দ্র ছিল খালসা কলেজ এবং হিন্দুদের ছিল বারাণসী বিশ্ববিদ্যালয়। কিন্তু এই সকল প্রতিষ্ঠান ন্যূনাধিক প্রাচীন হওয়ায়, সেগুলিকে সরকারী ভাতার উপর নির্ভর করিতে হইত। গান্ধীজী এগুলিকে এসিয়াটিক সংস্কৃতির অবিমিশ্র আশ্রমরূপে দেখিতে চাহিলেন। ১৯২০ সালের নভেম্বর মাসে তিনি আমেদাবাদে গুজরাটের জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিলেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শ ছিল এক সংযুক্ত ভারত। হিন্দুর 'ধর্ম' এবং মুসলমানের 'ইসলাম', এই ছিল ইহার যুগ্ম স্তম্ভ। ভারতের বিভিন্ন কথ্য ভাষাকে সংরক্ষণ করা এবং সেগুলিকে জাতীয় সংরক্ষণের উৎস হিসাবে ব্যবহার করাই ছিল এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য। গান্ধীজী অনুভব করিতেন যে "পশ্চিমী বিজ্ঞানের শিক্ষার অপেক্ষা এসিয়াটিক সংস্কৃতির সুনিয়মিত পর্যালোচনা কম অপরিহার্য নহে।" তাঁহার এইরূপ অনুভূতি সঙ্গতও। "সংস্কৃত ও আরবিক, পার্শিয়ান ও পালি, এবং মাগধী, এই সকল ভাষার বিপুল ঐশ্বর্যকে নাড়িয়াচাড়িয়া দেখিতে হইবে, আবিষ্কার করিতে হইবে এগুলির মধ্যে জাতীয় শক্তির উৎস কোথায় নিহিত আছে। প্রাচীন সংস্কৃতিগুলির উপর কেবল পুষ্ট হওয়া, বা সেগুলির কেবল পুনরাবৃত্তি করাই আদর্শ হইবে না। অতীতের ঐতিহ্যের উপর ভিত্তি করিয়া পরবর্তী কালের অভিজ্ঞতার সম্পদে সমৃদ্ধ করিয়া এক নব সংস্কৃতি গড়িয়া তোলাই হইবে লক্ষ্য। বিভিন্ন সংস্কৃতি, যেগুলি ভারতে আসিয়া বাসা বাঁধিয়াছে, ভারতের জীবনকে প্রভাবান্বিত করিয়াছে এবং যেগুলি নিজেও ভারতীয় মাটির প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইয়াছে, সেগুলির সমন্বয়ে সামঞ্জস্যে গড়িয়া তুলিতে হইবে এক আদর্শ সংস্কৃতি। সম্ভবত এই সমন্বয় 'স্বদেশী' ধরনেরই

হইবে। ইহাতে বিভিন্ন সংস্কৃতিগুলি ন্যায্য স্থান পাইবে। ইহা আমেরিকার অনুরূপ হইবে না—যেখানে একটি প্রধান সংস্কৃতি অন্যান্য অবশিষ্ট সংস্কৃতিগুলিকে আত্মসাৎ করে, যেখানে সামঞ্জস্যের দিকে লক্ষ্য নাই, লক্ষ্য আছে কেবল কৃত্রিম, বল-প্রযুক্ত ঐক্যের দিক। সকল ভারতীয় ধর্মই শিক্ষা দিতে হইবে। হিন্দুদের কোরান এবং মুসলমানদের শাস্ত্র পড়িবার সুযোগ থাকিবে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে কেবলমাত্র বাদ দেওয়ার মনোভাব ছাড়া আর কিছুই বাদ পড়িবে না। ইহা বিশ্বাস করিবে, মানবতার মধ্যে "অস্পৃশ্য" বলিয়া কিছুই নাই। হিন্দুস্থানী ভাষাকে আবশ্যিক করিয়া তোলা হইবে। কারণ, এই ভাষাটি সংস্কৃত, হিন্দী ও পারসিক উর্দুর সংমিশ্রণে গঠিত।"[৩৮]

কেবল জ্ঞানচর্চার দ্বারাই নহে, সযত্ন পেশাদারী শিক্ষার দ্বারাও স্বাধীনতার মনোভাব গড়িয়া তুলিতে হইবে।

গান্ধীজী আশা করেন, ধীরে ধীরে উচ্চতর বিদ্যালয়গুলি গড়িয়া উঠিবে, শহরে শহরে শিক্ষা ছড়াইয়া পড়িবে এবং তাহা জনসাধারণের মধ্যেও গিয়া পৌঁছিবে—যাহার ফলে......অনতিকালের মধ্যেই শিক্ষিত অশিক্ষিতের এই আত্মঘাতী ব্যবধান আর থাকিবে না। ভদ্রলোকদের মধ্যে কারখানার শিক্ষা এবং কারখানার লোকদের মধ্যে ভদ্রলোকের শিক্ষা, এই দুয়ের প্রবর্তনের ফলে জাতীয় সম্পদ-বণ্টনের অসাম্যের এবং সামাজিক অতৃপ্তির অনেকখানি প্রতিবিধানও ঘটিবে।

ইউরোপীয় শিক্ষাব্যবস্থা, যাহা হাতেনাতে কাজ করিবার ক্ষমতা না বাড়াইয়া কেবল চিন্তাশক্তিকেই বাড়াইয়া তোলে, তাহার প্রতিরোধে গান্ধীজী সকল স্কুল-কলেজের শিক্ষা-সূচীর মধ্যে নিম্নতর শ্রেণী হইতেই হাতের কাজ শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিতে চান। গান্ধীজী বিশ্বাস করেন, ছাত্রেরা যদি সুতা কাটিয়া তাহাদের স্কুলের মাহিনা দেয়, তাহা হইলে বেশ হয়। এইরূপে তাহারা নিজেদের জীবিকা উপার্জন করিতে শিখিবে এবং আত্মনির্ভরশীল হইয়া উঠিবে। মানসিক শিক্ষার ব্যাপারে—ইউরোপ যাহাকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করিয়াছে, গান্ধীজী তাহার উপর গোড়া হইতেই জোর দিতে চান। কিন্তু ছাত্রদের উপযুক্তরূপে শিক্ষা দেওয়ার পূর্বে প্রয়োজন উপযুক্ত শিক্ষকের।

উচ্চতর প্রতিষ্ঠানগুলিতেই গান্ধীজী এই নূতন শিক্ষার পত্তন বলিয়া ভাবেন। কারণ, এই প্রতিষ্ঠানগুলির উদ্দেশ্য হইল শিক্ষকদের তালিম দেওয়া। স্কুল বা কলেজের অপেক্ষাও এই প্রতিষ্ঠানগুলির কাজ বা দায়িত্ব অনেক বেশি। এগুলিকে আশ্রম বলাই ভালো। এই সকল আশ্রমে ভারতীয় শিক্ষার হোমাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া সমস্ত বিশ্বকে আলোকিত করিবে,—যেমনভাবে অতীত কালে পাশ্চাত্যে

---

৩৮ ইংরেজিকে, কিংবা অন্যান্য ইউরোপীয় ভাষাকেও বাদ দেওয়া হয় নাই। এগুলিকে স্কুলের পাঠ্য-তালিকার শেষে উচ্চতর শিক্ষার জন্য সংরক্ষিত করা হইয়াছে। শিক্ষার সকল সোপানেই অবশ্য স্থানীয় কথ্য ভাষাই ব্যবহৃত হইবে। গান্ধীজী এক উন্নততর পৃথিবীর স্বপ্ন দেখেন, যেখানে প্রভেদ থাকিবে, কিন্তু সেগুলি ভেদ হিসাবে থাকিবে না, থাকিবে বিভিন্ন দিক হিসাবে।

বেনেডিক্‌টাইন মঠগুলি হইতে ধর্মের অগ্রদূতেরা জ্ঞানের মশালহাতে বাহির হইতেন এবং জয় করিতেন কতো হৃদয়, কতো সাম্রাজ্য!

আমেদাবাদে তাঁহার আদর্শ প্রতিষ্ঠান 'সত্যাগ্রহ আশ্রম' বিদ্যালয়ের জন্য গান্ধীজী যে সকল নিয়ম নির্দেশ করিয়াছেন, সেগুলি ছাত্রদের অপেক্ষা নির্দেশকদের প্রতিই অধিক প্রযোজ্য, সেগুলি শিক্ষকদিগকে আশ্রমের ব্রতী করিয়া তোলে। সাধারণ ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে এই ব্রতের শপথগুলি সম্পূর্ণ নঞর্থক হইলেও, এখানে সেগুলি প্রেমের ও ত্যাগের সক্রিয় মনোভাবে অর্থময় হইয়া উঠে।

শিক্ষকদিগকে নিম্নলিখিত ব্রতগুলি পালন করিতে হয়:

(১) সত্যের ব্রত। সাধারণ ভাবে অসত্যের আশ্রয় না লওয়াই যথেষ্ট নহে। এমন কি দেশের মঙ্গলের জন্যও কোনো প্রতারণার কাজ করা চলিবে না। সত্যের জন্য পিতামাতার এবং গুরুজনের বিরোধী হওয়ার প্রয়োজন ঘটিতে পারে।

(২) অহিংসার ব্রত। কোনো জীবকে হত্যা না করাই যথেষ্ট নহে। যাহাকে অপরাধী বলিয়া বিশ্বাস করি, তাহাকেও আঘাত করা চলিবে না। তাহাদের উপর রুষ্ট হওয়া চলিবে না, তাহাদিগকে ভালোবাসিতে হইবে। অত্যাচারের প্রতিরোধ করো, অত্যাচারীকে আঘাত করিও না। তাহাকে প্রেমের দ্বারা জয় করো। তাহার অভিলাষের আনুগত্য স্বীকার করিও না, এমন কি মৃত্যুদণ্ডও গ্রহণ করো।

(৩) কৌমার্যের ব্রত। কৌমার্য ছাড়া পূর্ববর্তী ব্রত দুইটি পালন করা এক রকম অসম্ভব। স্ত্রীলোককে কামনার সহিত না দেখাই যথেষ্ট নহে। পাশবিক বৃত্তিগুলিকে দমন করিতে হইবে, এমন কি চিন্তাতেও সেগুলির প্রশ্রয় দিলে চলিবে না। বিবাহিত পুরুষকে তাঁহার স্ত্রীর সহিত সমস্ত জীবন বন্ধুর মতো কাটাইতে হইবে এবং স্ত্রীর সহিত পূর্ণ পবিত্রতার সম্পর্ক বজায় রাখিতে হইবে।

(৪) রসনার সংযম। খাদ্যের নিয়মিতি ও পবিত্রতা। যে সমস্ত খাদ্য পশু-প্রবৃত্তিকে প্ররোচিত করে বা যেগুলি অনাবশ্যক, সেগুলিকে বর্জন করিতে হইবে।

(৫) চৌর্য-পরিহারের ব্রত। যাহা সাধারণত অন্য ব্যক্তির সম্পত্তি বলিয়া বিবেচিত হয়, সেগুলিকে চুরি না করাই যথেষ্ট নহে। আমাদের যাহাতে কোনো প্রয়োজন নাই, তাহা ব্যবহার করাও এক প্রকার চৌর্য। আমাদের প্রতিদিন যাহা প্রয়োজন, তাহাই আমরা প্রতিদিন প্রকৃতির নিকট হইতে পাই, তাহার বেশি আমরা আদৌ লইব না।

(৬) অধিকার ত্যাগের ব্রত। অধিক জিনিসের অধিকারী না হওয়া বা অধিক জিনিস না রাখাই যথেষ্ট নহে, আমাদের দৈহিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত সামান্য কিছু রাখাও চলিবে না। জীবনকে সহজ সরল করিয়া তোলার কথা কেবলই ভাবিতে হইবে।

এই প্রধান ব্রতগুলির সহিত কয়েকটি গৌণ নিয়মও জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে:

(১) স্বদেশী। যাহার মধ্যে প্রতারণার সম্ভাবনা আছে, এমন কোন বস্তু ব্যবহার করিও না। কলে তৈয়ারী জিনিস ব্যবহার করিও না। কারখানায় শ্রমিকেরা প্রচুর কষ্ট পায়। সুতরাং কলে তৈয়ারী বস্তুগুলি যন্ত্রণা হইতেই প্রস্তুত। অহিংসার

ব্রতীদের বিদেশী মাল এবং কলে তৈয়ারী মাল নিষিদ্ধ বলিয়া বর্জন করিতে হইবে। ভারতের প্রস্তুত সাদাসিধে কাপড়-চোপড়ই পরিতে হইবে।

(২) নির্ভীকতা। যে ভয়ের বশীভূত হইয়া কাজ করে, সে কখনো অহিংসার বা সত্যের অনুসরণ করিতে পারে না। অহিংসার বা সত্যের ব্রতীকে রাজার, জনসাধারণের, জাতির, পরিবারের, তস্করের, দস্যুর, হিংস্র জন্তুর এবং মৃত্যুর ভয় ত্যাগ করিতে হইবে। যিনি সত্যিকারের নির্ভীক মানুষ, তিনি সত্যের জোরে, আত্মার জোরে, অপরের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করেন।

এই লৌহ-ভিতের প্রধান অংশগুলির প্রতিষ্ঠা করিয়াই গান্ধীজী অবিলম্বে অন্যান্য প্রয়োজনীয় বস্তুগুলির উল্লেখ করেন। ইহাদের মধ্যে প্রধান দুইটি হইল : শিক্ষকেরা দৈহিক পরিশ্রম করিয়া, কৃষিকার্য হইলেই ভালো, ছাত্রদের দৃষ্টান্তস্থল হইবেন। ভারতের প্রধান প্রধান ভাষাগুলি তাঁহাদের অবশ্যই জানিতে হইবে।

চার বৎসর হইতে উপরের দিকে যে কোন বয়স পর্যন্ত ছাত্রেরা আশ্রমে ভর্তি হইতে পারিবেন। দশ বৎসর কাল ধরিয়া তাঁহাদের পাঠ গ্রহণ করিতে হইবে। এবং এই দশ বৎসরের সমস্তটাই তাঁহাদের আশ্রমে কাটাইতে হইবে। ছেলেমেয়েদিগকে তাহাদের পিতামাতা ও পরিবার হইতে পৃথক করিয়া রাখা হয়। তাহাদের উপর পিতামাতা সকল আধিপত্য ত্যাগ করেন। ছেলেমেয়েরা পিতামাতার সহিত কখনো সাক্ষাৎ করে না। ছাত্রেরা সাদাসিধা পোশাক পরে, সাদাসিধা নিরামিষ খাবার খায় এবং ছুটি বলিতে সাধারণত যাহা বুঝায় তেমন কিছুই পায় না। তবে, প্রতি সপ্তাহে তাহারা দেড় দিন অবকাশ পায়। ঐ সময় তাহারা ব্যক্তিগতভাবে কোন সৃজনী শিল্প করিতে পারে। বৎসরের তিন মাস কাল পদব্রজে ভারতবর্ষের নানা স্থানে ঘুরিয়া কাটানো হয়। সমস্ত ছাত্রকেই হিন্দী এবং দ্রাবিড়ী কথ্য ভাষাগুলি অবশ্যই পড়িতে হয়। দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে প্রত্যেককেই ইংরেজি পড়িতে এবং পাঁচটি ভারতীয় ভাষার (উর্দু, বাংলা, তামিল, তেলেগু, এবং দেবনাগরী) অক্ষর চিনিতে হয়। ছাত্রেরা নিজেদের কথ্য-ভাষায় ইতিহাস, ভূগোল, অংক, অর্থনীতি এবং সংস্কৃত শিখে। এই সঙ্গে কৃষি এবং বয়নও তাহাদের শেখানো হয়। ধর্মের আবহাওয়া যে সারা শিক্ষা-ব্যবস্থাকে ছাইয়া থাকে, একথা বলাই বাহুল্য। ছাত্রদের যখন পঠদ্দশা শেষ হয়, তখন তাহারা তাহাদের শিক্ষকদের মত ব্রত গ্রহণ করিতে পারে, কিংবা বিদ্যালয় ত্যাগ করিতে পারে। সম্পূর্ণরূপে বিনাবেতনেই শিক্ষা দেওয়া হয়।

আমি গান্ধীজীর শিক্ষার ধারাটি একরকম পরিপূর্ণরূপেই বর্ণনা করিলাম, কারণ, ইহা হইতেই তাঁহার সকল কাজের শক্তিমান মানসিক দিকটা সহজেই প্রতিভাত হইবে। তাহা ছাড়া, ইহাকেই তিনি তাঁহার সমগ্র আন্দোলনের অন্তঃস্থল বলিয়া ভাবেন। নূতন ভারত গড়িয়া তুলিতে হইবে—সে-ভারতের আত্মা হইবে নিখাদ, শক্তিমান। এই আত্মাকে গড়িয়া তুলিতে হইলে চাই ত্যাগী ঋষিতুল্য মানবের এক বাহিনী—যেমনটি ছিল যিশু খ্রীষ্টের। গান্ধীজী ইউরোপীয় বিপ্লবীদের মতো আইন এবং অর্ডিন্যান্সের স্রষ্টা নহেন। তিনি এক নব মানবতার সংগঠক।

এই অবস্থায় অন্যান্য সরকারগুলি যাহা করিতেন, বৃটিশ সরকারও তাহাই

করিলেন, ঘটনার তাৎপর্য আদৌ বুঝিলেন না। প্রথমের দিকে তাঁহারা বিদ্রূপাত্মক ঘৃণার মনোভাব দেখাইলেন। বড়লাট লর্ড চেম্‌স্‌ফোর্ড ১৯২০ সালের আগস্ট মাসে এই আন্দোলনকে "মূঢ় পরিকল্পনাগুলির মধ্যে মূঢ়তম বলিয়া বর্ণনা করিলেন।" কিন্তু অনতিবিলম্বেই তাঁহাদিগকে তাঁহাদের এই স্বাচ্ছন্দ্যময় তাচ্ছিল্যের শিখর হইতে নীচে নামিয়া আসিতে হইল। ১৯২০-র নভেম্বর মাসেই গভর্নমেণ্ট একটি বিস্মিত ঘোষণা প্রকাশ করিলেন। ইহাতে আতঙ্কের ছায়াও যে ছিল না এমন নহে। ইহাতে অভিভাবকসুলভ পরামর্শের সহিত ধমকও দেওয়া হইল। জনসাধারণকে সাবধান করিয়া দেওয়া হইল যে, আন্দোলনের নেতাদের এখনো কোনোপ্রকার জবরদস্তি করা হইতেছে না। কারণ, তাঁহারা এখনো কোনো হিংসার কথা বলিতেছেন না। কিন্তু এবার যাঁহারা আইনের সীমা লঙ্ঘন করিবেন, কিংবা যাঁহাদের কথাবার্তা বিদ্রোহের প্ররোচনা দিবে, কিংবা অন্য কোনো প্রকারে হিংসার জন্য উত্তেজিত করিবে, তাঁহাদিগকে গ্রেফ্‌তার করার হুকুম দেওয়া হইল।

আইনের সীমা শীঘ্রই লঙ্ঘিত হইল। লঙ্ঘন করিলেন সরকার স্বয়ং। অসহযোগ আন্দোলন ব্যাপক এবং শক্তিশালী হইয়া উঠিতেছিল। তাই সরকারও ক্রমে আতঙ্কিত হইয়া উঠিতেছিলেন। ডিসেম্বর মাসে ব্যাপার সত্যই বিপজ্জনক আকার ধারণ করিল। এই পর্যন্ত অহিংসাত্মক অসহযোগ আন্দোলনকে কম-বেশী সাময়িক পরীক্ষা হিসাবেই ধরা হইতেছিল, এবং সরকার এই ভাবিয়া আরাম পাইতেছিলেন যে, নাগপুরে জাতীয় কংগ্রেসের আগামী ডিসেম্বর অধিবেশনে এই অসহযোগ আন্দোলন বাতিল হইয়া যাইবে। কিন্তু অসহযোগের অসমর্থন দূরে থাক, কংগ্রেস তাঁহাদের গঠনতন্ত্রের প্রথম ছত্রে এই কথাগুলি ঢুকাইয়া দিলেন :

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের উদ্দেশ্য হইল ভারতের জনসাধারণের দ্বারা আইনসঙ্গত এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে স্বরাজ লাভ করা।

অতঃপর সেপ্টেম্বরের বিশেষ অধিবেশনে কংগ্রেসে অসহযোগের যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল, কংগ্রেস তাহারই পুনরায় সমর্থন করিয়া তাহাকে আরো ব্যাপকতর করিলেন। অহিংসার নীতিকে সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করা হইল, এবং সেই সঙ্গে প্রায় সকলেই চাহিলেন যে, সমবেত স্থায়ী সংগ্রামের উদ্দেশ্যে ভারতের সকল প্রকার জনমতকে একত্রিত ও সঙ্ঘবদ্ধ করা হউক। বিশ্বস্ততার সঙ্গে সহযোগিতা করিবার জন্য কেবল হিন্দু ও মুসলমানকে আহ্বান করিলেই কংগ্রেসের চলিবে না। সেই সঙ্গে সম্ভ্রান্ত এবং নির্যাতিত শ্রেণীগুলিরও মিলন ঘটাইতে হইবে। তাহা ছাড়া, কংগ্রেস তাহার গঠনতন্ত্রে কয়েকটি আমূল পরিবর্তনও ঘটাইলেন, যাহার ফলে এক রকম সর্বভারতীয় প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা হইয়া গেল।[৩১]

---

[৩১] কংগ্রেসের নাগপুর অধিবেশনে ৪৭২৬ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে ৪৬৯ জন ছিলেন মুসলমান, ৫ জন পার্শি, ২ জন অস্পৃশ্য, ৪০৭৯ জন হিন্দু এবং ১০৬ জন স্ত্রীলোক।

নূতন গঠনতন্ত্রের ফলে ব্যবস্থা হইল যে, প্রতি পাঁচ হাজার অধিবাসী একজন প্রতিনিধি নির্বাচন করিবে। ইহার ফলে প্রতিনিধির সংখ্যা হইল ৬১৭৫। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের

অসহযোগের বর্তমান অবস্থাকে কংগ্রেস যে কেবলমাত্র প্রাথমিক ব্যবস্থা বলিয়াই ভাবেন, এবং পরবর্তীকালে তাহা যে এমন এক পরিপূর্ণ অবয়ব লাভ করিবে, যাহার ফলে ট্যাক্স বন্ধও ঘটিবে, একথা গোপন করিতে কংগ্রেস বিন্দুমাত্র চেষ্টাও করিলেন না। যাহাই হউক, এই পর্যন্ত, ভবিষ্যতের পথ প্রস্তুত করিয়া তুলিতে কংগ্রেসের বিদেশী দ্রব্য বর্জন-ব্যবস্থাকে তীব্রতর করিয়া তুলিলেন, সুতাকাটা ও বয়নের ব্যাপারকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন এবং সেই সঙ্গে ছাত্রসমাজ, পিতামাতা এবং ম্যাজিস্ট্রেটদের কাছে আরো উদ্যমের সহিত অসহযোগ পালন করিতে আবেদন জানাইলেন। যাঁহারা কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত অনুসারে কাজ করিলেন না, তাঁহাদিগকে রাজনীতিক জীবন হইতে বিতাড়িত করা হইল।

বস্তুত কংগ্রেসের এই প্রস্তাবের অর্থ হইল একটি রাষ্ট্রের মধ্যে অপর একটি রাষ্ট্র গঠন করা। বৃটিশ গভর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে সত্যিকারের ভারতীয় শাসনের পত্তন করা। কিন্তু বৃটিশ সরকার ইহা সহ্য করিতে পারিলেন না। কিছু-না-কিছু তাঁহাদের অবশ্য কর্তব্য হইয়া পড়িল। গভর্নমেণ্টকে হয় যুদ্ধ করিতে হইবে, নয় আপোসের আলোচনা চালাইতে হইবে। সরকার যদি অর্ধপথ আগাইয়া আসিতে রাজী হইতেন, তবে তাঁহাদের সহিত আপোস-মীমাংসা সহজেই ঘটিতে পারিত। ইতিপূর্বেই কংগ্রেস ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, "যদি সম্ভব হয়, তবে ইংল্যান্ডকে সাথে লইয়া," এবং যদি সম্ভব না হয়, তবে "তাহাকে বাদ দিয়া" ভারতবর্ষ তাহার লক্ষ্যে গিয়া পৌঁছিবে। কিন্তু কোনো বিদেশীয় জাতির সহিত ইউরোপীয় রাজনীতি জড়াইয়া পড়িলে প্রতি বারে যাহা হয়, এবারেও ঠিক তাহাই ঘটিল। আপোস-আলোচনার কোনো চেষ্টাই করা হইল না। বলপ্রয়োগের আশ্রয় গ্রহণ করা হইল। সুতরাং অস্ত্রের সাহায্যে এই আন্দোলনকে দমন করার জন্যে অজুহাতের সন্ধান চলিতে

অধিবেশন বড়দিনের কাছাকাছি বছরে একবার করিয়া হয়। ৩৫০ জন প্রতিনিধি লইয়া কংগ্রেসের একটি কমিটি গঠিত হইল। ইহার উপর কংগ্রেসের প্রস্তাবগুলিকে কার্যকরী করার এবং কংগ্রেসের নীতির প্রবর্তন করার সকল ব্যবস্থারই ভার রহিল। কংগ্রেসের অধিবেশনগুলির মধ্যবর্তী কালে কংগ্রেসের অনুরূপ ক্ষমতাই এই কমিটির উপর নিয়োগ করা হইল। এই কমিটির মধ্য হইতে পুনরায় পনেরো জন সদস্যকে লইয়া একটি ব্যবস্থাপক বোর্ডও রচিত হইল। পার্লামেন্টের সহিত মন্ত্রিসভার যে-সম্পর্ক, এই বোর্ডের সহিত কংগ্রেস কমিটিরও রহিল সেই সম্পর্ক।

নাগপুর কংগ্রেস প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিগুলিকে লইয়া কয়েকটি স্তর গঠনের পরিকল্পনাও করিলেন। এই কমিটিগুলি ১১টি প্রদেশের এবং ১২টি ভাষার প্রতিনিধিত্ব করিবে। এই কমিটিগুলির অধীনে গ্রামে গ্রামে বা কয়েকটি গ্রাম লইয়া গঠিত অঞ্চলে স্থানীয় কয়েকটি কমিটি থাকিবে। জাতীয় কর্মীদের লইয়া একটি দলগঠনের পরামর্শও কংগ্রেস দিলেন। ইহার নাম হইবে ভারতীয় জাতীয় সেবা-সংঘ। এই সংঘকে নিখিল ভারত তিলক-স্মৃতি স্বরাজ তহবিল হইতে অর্থসাহায্য করা হইবে।

স্ত্রী-পুরুষ, প্রত্যেকটি বয়স্ক মানুষ চার আনা চাঁদা দিলেই ভোটাধিকার পাইবেন।—অবশ্য যদি তিনি কংগ্রেস গঠনতন্ত্রের শপথগুলি স্বীকার করিয়া লন। একুশ বছর বয়স হইলে এবং কংগ্রেসের গঠনতন্ত্রের একনম্বর আর্টিকলের শপথগুলি মানিয়া লইলে এবং কংগ্রেসের আইনকানুনগুলি পালন করিতে স্বীকার করিলেই সদস্য নির্বাচিত হইবার সুযোগ পাওয়া যায়।

লাগিল। অজুহাতের অভাব ঘটিল না।

গান্ধীজী এবং কংগ্রেস কর্তৃক হিংসার নীতি প্রবর্তিত হওয়া সত্ত্বেও ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে কয়েকটি দাঙ্গা-হাঙ্গামা ঘটিল। অসহযোগ আন্দোলনের সহিত এগুলির কোনো সম্পর্ক না থাকিলেও তথাপি গোলযোগ চলিতে লাগিল। যুক্তপ্রদেশে জমিদারের বিরুদ্ধে কৃষাণ-বিদ্রোহ দেখা দিল, পুলিস হস্তক্ষেপ করিল এবং ফলে ঘটিল রক্তপাত। ইহার স্বল্পকাল পরেই শিখদের আকালি আন্দোলন, সম্পূর্ণ ধর্মসংক্রান্ত হইলেও, অসহযোগের রীতি অবলম্বন করিল এবং এই আন্দোলনের ফলে ১৯২১-এর ফেব্রুয়ারি মাসে প্রায় দুইশত শিখ নিহত হইলেন। কেহ বিনা মতলবে গান্ধীজী বা তাঁহার অনুচরদিগকে এই উন্মত্ততার জন্য দায়ী করিতে পারিত না। কিন্তু গভর্নমেণ্ট ইহাকে সুবর্ণ সুযোগ হিসাবে গ্রহণ করিলেন। ১৯২১ সালের মার্চ মাসে দমন আরম্ভ হইল। এবং যতোই মাসের পর মাস কাটিতে লাগিল, ততোই তাহা তীব্র হইতে তীব্রতর হইতে লাগিল। জনতার আক্রোশের হাত হইতে মদ্যবিক্রেতাদের রক্ষা করিবার প্রয়োজন দেখাইয়া সরকার নিজের হস্তক্ষেপের ন্যায্যতা প্রমাণ করিলেন। ইউরোপীয় সভ্যতা এবং সুরা যে হাত ধরাধরি করিয়া আগাইয়াছে, তাহার নমুনা এই প্রথম নহে। অসহযোগের স্বেচ্ছাসেবক সংগঠন-গুলিকে ভাঙিয়া দেওয়া হইল। সভাসমিতি নিষিদ্ধ করিয়া আইন জারী হইল। পুলিসের হাতে যথেচ্ছ ক্ষমতা আসিল; আন্দোলনকে অভিহিত করা হইল "বিপ্লবী এবং এনার্কিস্ট।" হাজারে হাজারে ভারতীয়রা গ্রেফ্‌তার হইলেন। দেশের বহু শ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধাস্পদকে বিনা বিচারে জেলে ঢুকানো হইল এবং তাঁহাদের উপর অত্যাচার চলিতে লাগিল। ইহার ফলে স্বভাবতঃ অনেক অসংযমী উত্তেজিত হইয়া উঠিল এবং এখানে ওখানে জনসাধারণের সহিত পুলিসের সংঘর্ষ ঘটিল। বহু গৃহে অগ্নি-সংযোগ হইল, জনসাধারণের অনেকেই আহত হইলেন। ভারতের যখন এই অবস্থা, তখন মার্চ মাসের শেষে আইন অমান্য সম্পর্কে আলোচনার জন্য নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি বেজওয়াদাতে মিলিত হইলেন। এই কমিটি অসামান্য দূরদৃষ্টি এবং সহিষ্ণুতার সহিত আইন অমান্যের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিলেন। কারণস্বরূপ দেখানো হইল যে, এই দুই-ধারওয়ালা তরবারি ব্যবহারের মতো প্রস্তুতি এখনো দেশে ঘটে নাই। আরো পরে আইন অমান্যের ব্যবস্থা গৃহীত হইবে।

ইতিমধ্যে গান্ধীজী ভারতকে ঐক্যবদ্ধ করার প্রচেষ্টায় দিনে দিনে অধিকতর ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, দেশের সকল প্রকার ধর্মগত, জাতিগত, শ্রেণীগত পার্থক্যকে দূর করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি ধনী এবং উন্নত বণিকসম্প্রদায় পার্শীদিগকে আহবান করিলেন[৪০]—যে পার্শীরা গান্ধীজীর মতে, কমবেশি সকলে রকফেলারী মনোবৃত্তিতে মলিন। তিনি আহবান করিলেন হিন্দুকে, মুসলমানকে—এক মৈত্রীর কঠিন বন্ধনে আবদ্ধ হইতে আবেদন জানাইলেন সকলকে। কুসংস্কার, পরস্পরের প্রতি সন্দেহ ও ভয়ের ফলে হিন্দু এবং মুসলমানের সম্পর্ক ক্রমেই তিক্ত

---

[৪০] ১৩ই মার্চ, ১৯২১।

হইয়া উঠিতেছিল। এই দুইটি জাতিকে মিলিত সহযোগিতার[৪১] পথে আনিবার কাজে গান্ধীজী আত্মনিয়োগ করিলেন। এই দুইটি জাতিকে তিনি মিশাইয়া দিতে চাহিলেন না, কারণ, তাহা ছিল অসম্ভব। তিনি চাহিলেন, এই দুইটি জাতিকে বন্ধুত্বের মধ্যে সংযুক্ত করিতে।[৪২]

'পারিয়া' এবং নির্যাতিত শ্রেণীগুলিকে পুনর্জীবিত করিয়া তুলিতে গান্ধীজী সর্বাপেক্ষা অধিক পরিশ্রম করেন। পারিয়াদের জন্য তাঁহার ব্যাকুল আবেদন, এবং যে নিষ্ঠুর সামাজিক অন্যায়ের চাপে পারিয়ারা নিষ্পেষিত, তাহার প্রতি তাঁহার অবিচল ঘৃণা ও আর্ত বেদনাবোধই কেবল তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিতে পারে। সমাজচ্যুতদের প্রতি তাঁহার এই মনোভাব তাঁহার বাল্যকাল হইতেই দেখা যায়। তিনি যখন বালক[৪৩] তখন একজন পারিয়া কেমন করিয়া তাঁহাদের বাড়িতে নোংরা কাজগুলি করিতে আসিত, সে কাহিনীও গান্ধীজী বর্ণনা করেন। বাল্যাবস্থায় গান্ধীজীকে শেখানো হইয়াছিল যে, কোনো পারিয়াকে স্পর্শ করিলে স্নান করিয়া পবিত্র হইতে হয়। কিন্তু কেন, গান্ধীজী তাহা বুঝিতে পারিতেন না। এ বিষয়ে তিনি প্রায়ই বাবা ও মাকে প্রশ্ন করিতেন। স্কুলে তিনি প্রায়ই অস্পৃশ্যদের ছুঁইতেন, এবং মা তাঁহাকে বলিতেন, কেবলমাত্র মুসলমানদের ছুঁইলে এই অপবিত্র স্পর্শের ফলভোগ এড়ানো যায়। গান্ধীজীর নিকট এই সমস্ত অতীব অন্যায়, নিষ্ঠুর এবং অকারণ বলিয়া মনে হইত। যখন তাঁহার বয়স মাত্র বারো, তখনই তিনি সারা ভারতের বিবেক হইতে এই অন্যায়ের কলঙ্ককে মুছিয়া ফেলিতে সংকল্প করেন। এই অধঃপতিত ভাইদের উদ্ধারের উপায়ও তিনি বাৎলান। এদের পক্ষ লইয়া গান্ধীজী যখন আলাপ করেন, তখন তাঁহার মনটি যেমন স্পষ্ট হইয়া উঠে, তেমনিট আর কখনো হয় না। পারিয়াদের দাবি যে তাঁহার কাছে কী, তাহা বেশ বোঝা যায় যখন তিনি বলেন যে, যদি কেহ প্রমাণ করিতে পারেন যে অস্পৃশ্যতা হিন্দুধর্মের

---

[৪১] ৬ই অক্টোবর, ১৯২০; ১১ই মে ও ১৮ই মে, ২৮শে জুলাই এবং ২০শে অক্টোবর, ১৯২১।

[৪২] গান্ধীজী মওলানা মহম্মদ আলির সহিত তাঁহার বন্ধুত্বের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া বলেন যে, তাঁহারা উভয়ে তাঁহাদের স্ব স্ব ধর্মের কাছে বিশ্বস্তই রহিয়াছেন।

গান্ধীজী মওলানার পুত্রের সহিত তাঁহার কন্যার বিবাহ দিতে বা তাঁহার সহিত এক খাদ্য গ্রহণ করিতে পারিবেন না। মওলানা আলির পক্ষেও এই এক কথাই খাটে। কিন্তু ইহাতে তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে প্রীতির কোনো ব্যাঘাত ঘটে নাই। তাঁহারা পরস্পরকে শ্রদ্ধা করেন, পরস্পরের উপর নির্ভর করেন।

অবশ্য একথাও গান্ধীজী বলেন নাই যে, হিন্দু-মুসলমানের পরস্পরের মধ্যে বিবাহ এবং একত্রে ভোজন নিন্দনীয়; তিনি বলেন, বর্তমানে ইহা অসম্ভব। এইরূপ সংমিশ্রণের অবস্থা আসিতে এই দুই জাতির অন্ততপক্ষে এক শতাব্দী লাগিবে। এইরূপ কোনো সংস্কারের নীতি কার্যে পরিণত করিবার ইচ্ছা থাকিলেও এখন এইরূপ সংস্কারে হাত না দেওয়াই ভালো। গান্ধীজী ইহার প্রতিবাদ করেন না, কিন্তু এই চেষ্টাকে অপরিণত বলিয়া ভাবেন। বর্তমানের একমাত্র প্রয়োজন হইল এই দুই জাতির পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা এবং বিশ্বাস রাখা। এখানেও গান্ধীজী তাঁহার ব্যবহারিক বুদ্ধির পরিচয় দেন। (২৪শে অক্টোবর, ১৯২১ সাল)।

[৪৩] ১৯২১ সালের ২৯শে এপ্রিল তারিখে প্রদত্ত বক্তৃতা।

অঙ্গ, তবে তিনি তাঁহার ধর্মও ত্যাগ করিবেন (যাঁহার কাছে ধর্মই সব!)। অন্যান্য দেশ ভারতের উপর যে অত্যাচার করিয়াছে, গান্ধীজী তাহার ন্যায্য কারণ এই অন্যায় পারিয়া-প্রথার মধ্যেই দেখিতে পান।

"আজ ভারতীয়রা যদি বৃটিশ সাম্রাজ্যে পারিয়ার অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তবে তাহা এক ন্যায়বান বিধাতার প্রদত্ত দন্ড মাত্র।...ইংরেজদিগকে তাহাদের রক্তাক্ত হস্ত ধুইয়া ফেলিতে বলিবার আগে আমাদের, হিন্দুদের নিজেদের, রক্তাক্ত হাতগুলি ধুইয়া ফেলাই কি উচিত হইবে না? অস্পৃশ্যতাই আমাদিগকে অধঃপাতিত করিয়াছে, দক্ষিণ আফ্রিকায়, পূর্ব আফ্রিকায়, এবং কানাডায় আমাদিগকে পারিয়া করিয়া তুলিয়াছে। যতদিন পর্যন্ত হিন্দুরা ইচ্ছা করিয়া অস্পৃশ্যতাকে হিন্দুধর্মের অঙ্গ বলিয়া গ্রহণ করিবে, ততদিন পর্যন্ত তাহাদের স্বরাজ লাভ অসম্ভব। ভারত অপরাধী। ইংল্যান্ড তাহার অপেক্ষা জঘন্য কোনো অপরাধ করে নাই। মানুষের প্রথম কর্তব্য হইল দুর্বল ও অসহায়কে রক্ষা করা, কাহারো মনে বিন্দুমাত্রও আঘাত না দেওয়া। আমরা আমাদের দুর্বল ভাইদের প্রতি যে অন্যায় করিয়াছি, যতক্ষণ তাহার প্রায়শ্চিত্ত না করি, ততক্ষণ আমরা পশুর সমান।"

গান্ধীজী চাহিয়াছিলেন যে, জাতীয় কংগ্রেস পারিয়া-ভাইদের স্কুল ও কূপের ব্যবস্থা করিয়া তাহাদের সাহায্য করিবে। কারণ পারিয়াদিগকে জনসাধারণের কূপ ব্যবহার করিতে দেওয়া হয় না। কিন্তু ততদিন পর্যন্ত কি হইবে? উচ্চশ্রেণীর লোকেরা কবে করুণা করিয়া নিজেদের অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত করিবে, সেইজন্য করজোড়ে অপেক্ষা করা গান্ধীজীর পক্ষে ছিল অসম্ভব। তাই তিনি নিজেই পারিয়াদের দলে মিশিয়া গেলেন। তিনি নিজেকে পারিয়াদের পুরোভাগে রাখিয়া পারিয়াদের সংগঠিত করিতে লাগিলেন। তিনি তাহাদের সহিত তাহাদের সমস্যা লইয়া আলাপ-আলোচনাও করিলেন। তাহাদের কি করা কর্তব্য? তাহারা কি ইংরেজ সরকারের কাছে আবেদন-নিবেদন করিবে? নিজদিগকে ইংরেজ সরকারের হাতে ছাড়িয়া দিবে? তাহা হইবে দাসত্বের পরিবর্তন মাত্র। হিন্দুধর্ম ত্যাগ করিবে? (হিন্দুধর্মে বিশ্বাসীর উদার ঔদ্ধত্য লক্ষ্য করুন!) খৃশ্চান হইবে? মুসলমান? হিন্দুধর্মের অর্থ যদি সত্যই অস্পৃশ্যতা হয়, তবে গান্ধীজী তাহাদিগকে ধর্ম ত্যাগ করিতে উপদেশ দিতে পারেন। কিন্তু হিন্দুধর্মের অর্থ তো তাহা নহে। অস্পৃশ্যতা হিন্দুধর্মের দেহে অস্বাস্থ্যকর ব্যাধি মাত্র, ইহার উচ্ছেদ অবশ্য কর্তব্য। আত্মরক্ষার জন্য পারিয়াদিগের নিজদিগকে সংগঠিত হইতে হইবে। তাহারা হিন্দুদের সহিত কোনো সম্বন্ধ রাখিতে অস্বীকার করিয়া হিন্দুধর্মের সম্পর্কে তাহারা অসহযোগের নীতি অবলম্বন করিতেও পারে। (গান্ধীজীর মতো দেশপ্রেমিকের মুখেও সমাজ-বিদ্রোহের এই অসাধারণ উদ্ধত উপদেশ!) কিন্তু অসুবিধার ব্যাপার হইল এই যে, পারিয়াদের কোনো নেতা নাই। তাহারা নিজেদিগকে সংঘবদ্ধ করিতেও পারে না। সুতরাং, তাহাদের পক্ষে সর্বাপেক্ষা উত্তম পন্থা হইল সাধারণ অসহযোগের আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করা। কারণ, এই আন্দোলনের অন্যতম উদ্দেশ্য সকল শ্রেণীর সমন্বয় করা। সত্যিকারের অসহযোগ হইল এক প্রকার শুদ্ধির ধর্মানুষ্ঠান। যাঁহারা

অস্পৃশ্যতায় বিশ্বাস করেন, তাঁহারা কখনো অসহযোগ আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করিতে পারেন না। এমনিভাবে গান্ধীজী ধর্ম, মানবতা ও দেশপ্রেমের এক মহামিলন ঘটাইলেন।[৪৪]

পারিয়াদের সংঘবদ্ধ করিবার প্রথম চেষ্টাগুলি বেশ গাম্ভীর্যের সঙ্গেই ঘটিল। ১৯২১ সালের ১৩ই ও ১৪ই এপ্রিল তারিখে আমেদাবাদে একটি নির্যাতিত শ্রেণীসম্মিলনও হইল। গান্ধীজী এই সভায় সভাপতিত্ব করেন। তিনি কেবল পারিয়া-প্রথার উচ্ছেদ চাহিলেন না। সেই সঙ্গে পারিয়াদিগকে বলিলেন, তাহারা যেন নিজেদের যোগ্যতার প্রমাণ দেয়। গান্ধীজী বলেন যে, তিনি এই নবজাগ্রত ভারতের সমাজজীবনে পারিয়াদের কাছে অনেক কিছুই আশা করেন। গান্ধীজী পারিয়াদের মধ্যে আত্মবিশ্বাসের সঞ্চার করিবার চেষ্টা করিলেন। তিনি তাহাদিগকে তাঁহার নিজের দৃপ্ত আদর্শে ভরিয়া তুলিলেন। গান্ধীজীর মতে, এই "নির্যাতিত শ্রেণীগুলির" মধ্যে বিপুল সম্ভাবনা সুপ্ত রহিয়াছে। তিনি বিশ্বাস করেন, অস্পৃশ্য শ্রেণী তাহার নিজের গুণে পরবর্তী পাঁচ মাসের মধ্যেই ভারতের মহা পরিবারে তাহার ন্যায্য আসন প্রতিষ্ঠা করিয়া লইবে।

গান্ধীজী যখন দেখিলেন যে, তাঁহার আবেদন জনসাধারণের হৃদয়ে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে, তখন তাঁহার আনন্দের সীমা রহিল না। ভারতের বহু অঞ্চলেই পারিয়াদের মুক্তি ঘটিল।[৪৫] গান্ধীজী তাঁহার গ্রেফতারের পূর্বদিনেও পারিয়াদের প্রগতি ও ব্যবস্থা সম্পর্কে আবেদন করিয়া এক বক্তৃতা করিলেন। ব্রাহ্মণরাও সাহায্য করিতেছিলেন। উচ্চশ্রেণীর লোকেরাও ভ্রাতৃ-ভাব এবং অনুতাপের বহু মর্মস্পর্শী দৃষ্টান্ত দেখাইলেন। কোনো এক ব্রাহ্মণ-সন্তান উনিশ বছর বয়সে অস্পৃশ্যদের সঙ্গে থাকিবার জন্যে মেথরের কাজ করেন। গান্ধীজী এই ঘটনার উল্লেখও করিলেন।[৪৬]

এমনি মহানুভবতার সঙ্গেই গান্ধীজী আর একটি সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করেন, নারীর মুক্তি-সংগ্রাম।

ভারতের যৌন-সমস্যা বড়োই জটিল। বাল্যবিবাহের ফলে জাতির দৈহিক ও নৈতিক শক্তির অপব্যয় ঘটে। দৈহিক লালসার সর্বগ্রাসী চিন্তা পুরুষের মনকে সর্বদা আচ্ছন্ন রাখে। ইহার ফলে স্ত্রী-জাতির আত্মসম্মানের হানি হয়। হিন্দু জাতীয়তাবাদীদের অধঃপতিত মনোভাব সম্পর্কে নারীদের অভিযোগগুলিও

---

[৪৪] ২৭শে অক্টোবর, ১৯২০।

[৪৫] ১৯২১ সালের এপ্রিল মাসের শেষের দিকে অস্পৃশ্যতা হ্রাস পাইতে লাগিল। অনেক গ্রামে হিন্দুদের মধ্যেই পারিয়ারা বসবাসের সুযোগ এবং হিন্দুদের সহিত সমান অধিকার পাইল। (২৭শে এপ্রিল, ১৯২১ সালে) অন্যান্য অঞ্চলে, বিশেষ করিয়া মাদ্রাজে অবশ্য তাহাদের অবস্থা শোচনীয়ই রহিয়া গেল। (২৮শে সেপ্টেম্বর, ১৯২১) এখন হইতেই ভারতের জাতীয় এসেমব্লিগুলির কর্মসূচীতেও এই সমস্যা গৃহীত হইল। ইতি-পূর্বেই নাগপুর অধিবেশনে কংগ্রেস অস্পৃশ্যতার কলঙ্ককে মুছিয়া ফেলিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

[৪৬] ২৭শে এপ্রিল, ১৯২১।

গান্ধীজী প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তিনি নারীদের পক্ষ সমর্থন করিলেন। বলেন, নারী জাতির এই প্রতিবাদ হইতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, অস্পৃশ্যতার মতোই আরো একটি গলিত ব্যাধি ভারতের দেহে বর্তমান রহিয়াছে। কিন্তু নারী জাতির এই প্রশ্ন শুধু ভারতীয় প্রশ্নই নহে। এই ব্যাধিতে সমস্ত পৃথিবী আজ ভুগিতেছে। পারিয়াদের বেলাতেও গান্ধীজী যেমনটি করিয়াছিলেন, এবারেও তিনি তেমনি উৎপীড়কদের অপেক্ষা উৎপীড়িতদের কাছেই প্রত্যাশা করিলেন বেশি। স্ত্রীলোকেরা যাহাতে নিজেদিগকে কেবলমাত্র পুরুষদের কামনার বস্তু বলিয়া ভাবিতে বন্ধ করিয়া পুরুষদের সম্মানের উপযুক্ত হন এবং সম্মান দাবি করেন, সে সম্বন্ধে স্ত্রীলোকদিগকে আহ্বান জানাইলেন। স্ত্রীলোকেরা আসুন, তাঁহারা নিজেদের দেহের কথা ভুলিয়া জনসাধারণের কাজে আত্মনিয়োগ করুন, বিপদের সম্মুখীন হউন এবং নিজেদের আদর্শের জন্যে, বিশ্বাসের জন্যে যন্ত্রণা ভোগ করুন। কেবলমাত্র বিলাস ত্যাগ করিলে, বিদেশী দ্রব্য ছুঁড়িয়া ফেলিলে বা পোড়াইলে চলিবে না। তাঁহাদিগকে পুরুষের সহিত সমস্যা এবং ত্যাগের অংশও গ্রহণ করিতে হইবে। কলিকাতায় বহু খ্যাতনামা মহিলাই গ্রেফতার হইলেন। ইহা হইতেই যথোপযুক্ত মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। করুণাভিক্ষার বিনিময়ে স্ত্রীলোকদিগকে আদর্শের জন্যে সহনশীলতায় পুরুষের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে হইবে। যখন সহিষ্ণুতার প্রশ্ন আসিবে, তখন সর্বদাই স্ত্রীলোকেরা পুরুষকে ছাড়াইয়া যাইবে। সুতরাং স্ত্রীলোকদের ভয়ের কোনো কারণ নাই। তাঁহাদের মধ্যে যিনি সর্বাপেক্ষা দুর্বল, তিনিও আত্মসম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিবেন। কেমন করিয়া মরিতে হয় যে জানে, তাহার ভয়ের কি কারণ থাকিতে পারে?[৪৭]

পতিতা ভগিনীদের কথাও গান্ধীজী ভোলেন নাই।[৪৮] অন্ধ্রে এবং বরিশালে পতিতাদের সহিত সম্মেলনে গান্ধীজীর সাক্ষাৎ ও আলোচনা ঘটে, এ সম্বন্ধেও তিনি উল্লেখ করেন। গান্ধীজী সততা এবং সারল্যের সহিত আলাপ করেন। তাঁহারাও গান্ধীজীর উপর পরিপূর্ণ বিশ্বাস রাখিয়া তাঁহার কথার জবাব দেন এবং এ বিষয়ে তাঁহার উপদেশ-পরামর্শ চান।

তাঁহারা যাহাতে সৎপথে থাকিয়া জীবিকা উপার্জন করিতে পারেন, এমন কয়েকটি পন্থাও তিনি বাৎলাইয়া দেন, সুতা কাটার প্রস্তাবও করেন। সাহস এবং সাহায্য পাইলে তাঁহারা পরদিনই কাজ সুরু করিতে রাজী হইলেন। গান্ধীজী ভারতের পুরুষদিগকেও এ বিষয়ে আহ্বান করিলেন, তাঁহারা যাহাতে স্ত্রীজাতিকে সম্মান করেন, সেজন্য অনুরোধ জানাইলেন :

"আমাদের বিপ্লবে পাপের জুয়ার কোনো স্থান নাই। 'স্বরাজ' কথার অর্থ হইল যে আমরা ভারতের প্রত্যেকটি অধিবাসীকে নিজের ভাই ও ভগিনীর মতো দেখিব। স্ত্রীজাতি দুর্বলতর নহেন, তাঁহারা মানবজাতির শ্রেষ্ঠতর অর্ধেক অংশ।

---

[৪৭] ২১শে জুলাই, ১৯২১ এবং ৬ই অক্টোবর, ১৯২০।
[৪৮] ২১শে জুলাই, ১১ই আগস্ট; ১৫ই ডিসেম্বর, ১৯২১।

মহত্তরও। এমন কি আজো তাঁহারা ত্যাগ, নীরব সহিষ্ণুতা, বিনয়, বিশ্বাস ও বিদ্যার প্রতিমূর্তি। পুরুষের উদ্ধত যুক্তির অপেক্ষা অধিকাংশ সময়েই নারীর অনুভূতি-লব্ধ জ্ঞানই সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে।"

নিজের স্ত্রী হইতে সুরু করিয়া ভারতের সমস্ত স্ত্রীজাতির মধ্যে গান্ধীজী সর্বদাই বুদ্ধিদৃপ্ত এক সহায়তা এবং বোধশক্তির সন্ধান পাইয়াছেন। এই স্ত্রীলোকদের মধ্য হইতেই তিনি গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহার কয়েকজন শ্রেষ্ঠা শিষ্যাকেও।

১৯২১ সালে গান্ধীজীর ক্ষমতা মধ্যগগনে আসিল। তাঁহার নৈতিক নেতৃত্বের ক্ষমতাও হইয়া পড়িল বিশাল। রাজনীতিক কর্তৃত্বের সন্ধান না করিয়াও তিনি ইহার অপরিমিত অধিকার হাতে পাইলেন। জনসাধারণ তাঁহাকে মুনি-ঋষির মতো দেখিতে লাগিল। শ্রীকৃষ্ণের অবতার হিসাবে তাঁহার ছবিও আঁকা হইল। ঐ বৎসরের শেষে ডিসেম্বর মাসে নিখিল ভারত জাতীয় কংগ্রেস তাঁহাদের সমস্ত ক্ষমতা গান্ধীজীর হাতে ছাড়িয়া দিলেন। তাঁহার পরে কে এই ক্ষমতার উত্তরাধিকারী হইবেন, তাহা নির্বাচনের ক্ষমতাও তাঁহাকে দেওয়া হইল। ভারতীয় কর্ম-নীতির তিনিই সর্বময় কর্তা হইয়া উঠিলেন। যদি তিনি উপযুক্ত ভাবেন, তবে রাজনীতিক বিপ্লব সুরু করার ভার তাঁহার উপরেই দেওয়া হইল। এমন কি ধর্ম-সংক্রান্ত সংস্কারের অধিকারও তিনি পাইলেন।

কিন্তু তিনি তেমনটি কিছুই করিলেন না। করিতে ইচ্ছাও করিলেন না।

এ কি নৈতিক মহিমা? না, নৈতিক দ্বিধা? হয়তো দুইই। একটি মানুষকে আর একটি মানুষের পক্ষে বোঝা বড়ো কঠিন, বিশেষ করিয়া তাঁহারা যদি বিভিন্ন দুই জাতির এবং বিভিন্ন দুই সভ্যতার মানুষ হন। আবার গান্ধীজীর মতো গভীর ও জটিল একটি মনের সম্বন্ধে পর্যালোচনা করার সময় তাহা কী কঠিনই না হইয়া উঠে! ভারতের সেই ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ বৎসরে, ঘটনার আবর্তে এই জাতীয় কর্ণধারের হাত কাঁপিয়া উঠিয়াছিল কিনা তাহা বলা কঠিন, তবে তিনি যে তাঁহার স্ব-নির্বাচিত পথে ভারতকে চালিত করিতে পারিয়াছিলেন, তাহা নিঃসন্দেহ। যাহা হউক, এই জীবন্ত মানব-প্রহেলিকাটির সম্পর্কে আমার কি মনোভাব, তাহা আমি ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিব। এবং ব্যাখ্যার সময় এই মনোভাবের প্রতি আমার ভক্তি ও আন্তরিকতার বিন্দুমাত্র ত্রুটি ঘটিবে না।

গান্ধীজীর হাতে শক্তি ছিল প্রচুর, তাহার অপব্যবহারের বিপদও ছিল তেমনি অপরিমিত। তাঁহার অভিযানের সামান্যতম তরঙ্গও কোটি কোটি মানুষকে দোলা দিত। তাই এই তরঙ্গসঙ্কুল মহাসমুদ্রের বক্ষে অবিচল দাঁড়াইয়া থাকাও ছিল যেমন কঠিন, তেমনি কঠিন ছিল এই আন্দোলনকে ইহার নিয়মিত গতিপথে চালিত করা। উদ্ধত, উন্মত্ত, অবারিত গণবিক্ষোভের সহিত সহিষ্ণুতার মিলন ঘটানো একটি অতিমানবিক ঘটনাই বটে! প্রশান্ত, পবিত্রমনা এই কর্ণধার, তিনি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেন, ভগবানের উপর নির্ভর করেন। কিন্তু ভগবানের যে-বাণী তাঁহার নিকট আসে, তাহাও জনতার কোলাহলের আবর্তে প্রায় হারাইয়া

যায়। সে বাণী কি অপরের কাছে কোনোদিন পেঁছিবে?

আপনার দম্ভের ফলে পদস্খলিত হইবার বিপদ তাঁহার নাই। স্তুতিও, যতোই অধিক হউক, তাঁহার বিভ্রান্তি ঘটাইতে পারিবে না। স্তুতি তাঁহার কাছে কেবল অশোভন অস্বাভাবিক নহে, তাঁহার বিনম্র মনোভাবকে তাহা আঘাতও করে। গান্ধীজী ঋষি ও পয়গম্বরদের মধ্যে ব্যতিক্রম। কারণ, তিনি কোনো স্বপ্নের দ্রষ্টা নহেন, কোনো দৈববাণীও তিনি শোনেন না। তিনি যে কোনো অতিপ্রাকৃতিক শক্তির দ্বারা পরিচালিত হইতেছেন, এমন বিশ্বাস তিনি নিজেও করেন না, অপরকে করাইতেও চান না। বিশ্বাস এবং আন্তরিকতাই তাঁহার অস্ত্র। শান্ত, শুভ্র তাঁহার ললাট, বৃথা গর্বহীন তাঁহার অন্তর। অন্যান্য মানুষের মতোই তিনি মানুষ। তিনি সাধু নন, সন্ত নন। জনসাধারণ যে তাঁহাকে সাধু-সন্ত বলিয়া অভিহিত করে তাহাও তিনি চান না। (অথচ তাঁহার মনোভাব দেখিয়া মনে হয় তিনি একজন সন্ত।)

গান্ধীজী বলেন 'সন্ত' কথাটিকে বর্তমানের জীবন হইতে বাতিল করিয়া দিতে হইবে।

"প্রত্যেকটি সৎ হিন্দু যেমনটি করেন, আমিও তেমনি ভাবে উপাসনা করি। আমি বিশ্বাস করি যে আমরা সবাই ভগবানের বাণীর বাহক হইয়া উঠিতে পারি। ভগবানের অভিরুচির কোনো প্রকার বিশেষ প্রকাশ আমার কাছে ঘটে নাই। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ভগবান প্রতিদিনই প্রত্যেক মানুষের কাছে আপনাকে প্রকাশ করিতেছেন। তবে আমরা তাঁহার 'নীরব ভাষা' শুনিতে চাই না, এই মাত্র।...আমি নিজেকে ভারত ও মানবতার বিনীত ভৃত্য ছাড়া আর কিছু বলিয়া দাবি করি না। কোনো ধর্মসম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করার বাসনাও আমার নাই। বাস্তবিকপক্ষে একদল অনুচরের সম্প্রদায় লইয়া সন্তুষ্ট হইবার মতো স্বল্প উচ্চাশাও আমি পোষণ করি না। কারণ, কোনো নূতন সত্যের আমি প্রতিনিধি নই। সত্যকে আমি যেমন ভাবে জানিয়াছি, আমি সেইমতো চলিতে ও প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিতেছি। বহু পুরাতন সত্যের উপর আমি কেবল নূতন আলোক আরোপ করিয়াছি মাত্র।"[৪৯]

ব্যক্তিগতভাবে কখনো তাঁহার দীনতার অভাব নাই। তিনি বিবেকবান। ভারতীয় দেশপ্রেমিক কিংবা অসহযোগের পয়গম্বর হিসাবে সঙ্কীর্ণমনা হইতে তিনি সম্পূর্ণ অশক্ত। কোনো প্রকার নির্যাতনকে তিনি প্রশ্রয় দেন না, এমন কি কোনো আদর্শের জন্যেও না। সরকারী নির্যাতনের স্থলে অসহযোগের নির্যাতনকে প্রতিষ্ঠিত করিলে চলিবে না।[৫০] গান্ধীজী তাঁহার স্বদেশকে অন্য কোনো দেশের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে অনিচ্ছুক। তাঁহার দেশপ্রেম ভারতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নহে। "আমার কাছে দেশপ্রীতি হইল মানবপ্রীতির সমান। আমি মানুষকে ভালোবাসি, তাই আমি দেশকেও ভালোবাসি। অন্য দেশকে বাদ দিয়া আমার দেশপ্রীতি নহে। আমি ভারতের মঙ্গলের জন্যে ইংল্যান্ডকে কিংবা জার্মানিকে আঘাত করিতে পারিব না। আমার

---

[৪৯] ১১ই মে, ১৯২০; ২৫শে মে, ১৩ই জুলাই, ২৫শে আগস্ট, ১৯২১।
[৫০] ৮ই ডিসেম্বর, ১৯২০।

জীবনের পরিকল্পনায় সাম্রাজ্যবাদের কোনো স্থান নাই, মানব-প্রীতিতে যদি উত্তাপ না থাকে, তবে দেশপ্রেমের উত্তাপও কমিয়া যায়।[৫১]

কিন্তু তাঁহার শিষ্যরাও কী সর্বদা এমনি ভাবেই অনুভব করেন? তাঁহাদের মুখে গান্ধীজীর নীতির কি পরিণতি ঘটে, তাঁহাদের দ্বারা ব্যাখ্যাত হইয়া এই নীতি কিভাবে জনসাধারণের কাছে পেঁাছে?

যখন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কয়েক বছর ইউরোপে ঘুরিয়া ১৯২১-এর আগস্ট মাসে দেশে ফিরিলেন, তখন তিনি জনসাধারণের মনোভাবের পরিবর্তন দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। এমন কি, ভারতে ফিরিবার পূর্বেই তিনি ইউরোপ হইতে ভারতে বন্ধুদিগকে লেখা বহু চিঠিতে ধারাবাহিক ভাবে উদ্বেগ প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহার বহু পত্রই 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল।[৫২] এই দুই মহা মনীষী, রবীন্দ্রনাথ এবং গান্ধী, ইঁহাদের মধ্যে মতদ্বৈধ সত্যই লক্ষণীয়। ইঁহাদের পরস্পরের প্রতি পরস্পরের প্রীতি ও শ্রদ্ধা ছিল অপরিসীম, কিন্তু মনোভাব ও অনুভূতির মধ্যে ব্যবধান ছিল ভয়াবহ, যে-ব্যবধান থাকে দার্শনিক ও প্রচারকের মধ্যে, একজন প্লেটো ও একজন সেণ্ট পলের মধ্যে। আমরা এক দিকে দেখি, ধর্মবিশ্বাস এবং করুণা চাহিতেছে এক নূতন মানবতার প্রতিষ্ঠা করিতে। অন্য দিকে দেখি, প্রশান্ত প্রমুক্ত উদার এক ধীশক্তি চাহিতেছে সহানুভূতি ও বুদ্ধির মধ্য দিয়া সমগ্র মানবতার আকাঙ্ক্ষা-কামনাকে ঐক্যবদ্ধ করিতে।

রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজীকে সর্বদা সন্ত হিসাবেই দেখিয়া আসিয়াছেন এবং আমি তাঁহাকে প্রায়ই গান্ধীজী সম্পর্কে সম্ভ্রমের সহিত কথা বলিতে শুনিয়াছি। যখন একবার মহাত্মার সম্পর্কে আমি টলস্টয়ের উল্লেখ করি, তখন টলস্টয়ের অপেক্ষা গান্ধীজীর জীবন যে অধ্যাত্ম-আলোকে অধিকতর প্রতিভাত, রবীন্দ্রনাথ তাহা দেখাইতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু এখন বুঝিতেছি, গান্ধীজীকে তাঁহার অপেক্ষা আমিই ভালো বুঝিয়াছি। গান্ধীজীর কাছে সমস্তই হইল স্বভাব—সরল, সহজ, শুদ্ধ স্বভাব—তাঁহার সমস্ত সংগ্রামগুলি তাই ধর্মের মহিমায় মহিমান্বিত। টলস্টয়ের কাছে সমস্তই ছিল এক সদম্ভ বিদ্রোহ—দম্ভের বিরুদ্ধে, ঘৃণা—ঘৃণার বিরুদ্ধে, উচ্ছ্বাস—উচ্ছ্বাসের বিরুদ্ধে। টলস্টয়ের কাছে সকল কিছুই বলপ্রয়োগ—গান্ধীজীর কাছে সকল কিছুই বলের অপ্রয়োগ। ১৯২১ সালের ১০ই এপ্রিল তারিখে রবীন্দ্রনাথ লণ্ডন হইতে লেখেন: "আমরা গান্ধীজীর নিকট কৃতজ্ঞ,

---

[৫১] ১৬ই মার্চ, ১৯২১।

[৫২] "লেটার্স ফ্রম এ্যারড।" ১৯২১ সালে মে মাসের মডার্ন রিভিউতে ২রা, ৫ই এবং ১৩ই মার্চের পত্রগুলি প্রকাশিত হয়। ভারতে রবীন্দ্রনাথের প্রত্যাবর্তনের পর 'এ্যাপীল টু ট্রুথ' লিখিত হয় এবং তাহা প্রকাশিত হয় ১৯২১-এর ১লা অক্টোবরের মর্ডান রিভিউতে। এই দুই ব্যক্তি অবশ্য কেবল তর্কমূলক রচনাতেই তাঁহাদের মতামত প্রকাশ করেন নাই। তাঁহাদের মধ্যে সাক্ষাৎ ও দীর্ঘ আলাপ-আলোচনাও ঘটে। এই সাক্ষাৎকার সম্পর্কে কোনো মন্তব্য তাঁহারা প্রকাশ করেন নাই। সি. এফ. এণ্ড্রিউজ উপস্থিত ছিলেন। তিনি এই আলোচনা সম্পর্কে জানান এবং রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধী পরস্পরের অভিমতের সমর্থনে কি কি যুক্তি দেখান, তাহাও বলেন।

কারণ, মানুষের স্বর্গীয় সত্তায় ভারতের বিশ্বাস যে আজো বাঁচিয়া আছে, তাহা প্রমাণ করিবার সুযোগ তিনিই ভারতকে দিয়াছেন।" গান্ধীজীর অভিযানের সাফল্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ সন্দেহ প্রকাশ করিলেও, তিনি যখন ভারতে ফেরার পথে ফ্রান্স হইতে রওনা হইয়া আসেন, তখন সকল দিক হইতেই গান্ধীজীকে সাহায্য করিবার পরিকল্পনা লইয়াই আসেন। এমন কি, ১৯২১ সালের অক্টোবর মাসের ফতোয়া, "এ্যাপীল টু ট্রুথ"—এ সম্বন্ধে আমি পরে আলোচনা করিব—যাহা এই দুটি মানুষের মধ্যে বিভেদের সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহাও গান্ধীজীর প্রতি সুন্দর এক প্রশস্তি গাহিয়া সুরু হয়। ভাষায় এমনটি সচরাচর দেখা যায় না।

রবীন্দ্রনাথের প্রতি গান্ধীজীর মনোভাব প্রীতিময় শ্রদ্ধার মনোভাব। তাঁহাদের মধ্যে মতভেদের ফলেও এই মনোভাব কখনো বিন্দুমাত্রও ক্ষুণ্ণ হয় নাই। গান্ধীজী যে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তর্কযুদ্ধে নামিতে অস্বস্তি বোধ করিতেন, তাহা স্পষ্টই বোঝা যায়। ব্যক্তিগত মন্তব্যের উল্লেখ করিয়া গান্ধীজীর কোনো কোনো বন্ধু এই তর্ক-যুদ্ধকে তিক্ত করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিলেও গান্ধীজী তাঁহাদিগকে থামাইয়া দিতেন এবং তিনি রবীন্দ্রনাথের কাছে যে কতোখানি ঋণী, তাহা ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইতেন।[৫৩]

ইহা সত্ত্বেও এই দুটি মানুষের মধ্যে ভাঙন প্রশস্ততর হওয়া অপরিহার্য হইয়া উঠিল। গান্ধীজীর প্রেম ও বিশ্বাসের অগাধ ঐশ্বর্য যে তিলকের মৃত্যুর পর হইতে কেবল রাজনীতিক উদ্দেশ্যেই ব্যয়িত হইতেছে, রবীন্দ্রনাথ ১৯২০ সালেই এ-জন্যে খেদ করেন। অবশ্য গান্ধীজী যে নিশ্চিন্ত মনে রাজনীতির মল্লভূমিতে নামিয়াছিলেন, তাহাও নহে। যখন তিলকের মৃত্যু হইল, তখন ভারতে রাজনীতিক নেতা আর কেহই ছিলেন না। সুতরাং তিলকের শূন্য স্থান কাহারো না কাহারো পূরণ করার একান্ত প্রয়োজন ছিল।

গান্ধীজী বলেন :[৫৪]

"আজ যদি আমি রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করিয়াছি বলিয়া মনে হয়, তবে তাহার একমাত্র কারণ এই যে রাজনীতি আমাদিগকে নাগপাশের মতো জড়াইয়া রহিয়াছে। আমরা যতই চেষ্টা করি না কেন, ইহার হাত হইতে আমাদের কোনো মতেই অব্যাহতি নাই। আমি সর্পের সহিত যুঝিতে চাই।......আমি রাজনীতির মধ্যে ধর্মকে ঢুকাইবার চেষ্টা করিতেছি।"

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ইহাই খেদ। ১৯২০ সালের ৭ই সেপ্টেম্বর তিনি লেখেন, মহাত্মা গান্ধী যে নৈতিক শক্তির প্রতিভূ, এবং এই পৃথিবীতে এক মাত্র প্রতিভূ, সেই নৈতিক শক্তিতে আমাদের সকলের প্রয়োজন আছে। এই মহামূল্য সম্পদ যে

---

[৫৩] ১৯২১ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারি। 'টু সেক্রেড ফর পাবলিকেসন' শীর্ষক এক প্রবন্ধে গান্ধীজী রবীন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার দীর্ঘকালীন বন্ধুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেন। গান্ধীজী রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনে প্রায়ই আসিতেন এবং ইহাকে বিশ্রামাবাস বলিয়াই ভাবিতেন। গান্ধীজী যখন ইংল্যান্ডে ছিলেন, তখন তাঁহার ছেলেরা এখানেই থাকিতেন।

[৫৪] ১২ই মে, ১৯১০।

রাজনীতির দুর্বল তরণীতে নিক্ষিপ্ত হইবে এবং বিভিন্ন বাসনার অবিরাম তরঙ্গাঘাতে জর্জরিত হইবে, তাহা সত্যই ভারতের এক গুরুতর দুর্ভাগ্য। কারণ, রবীন্দ্রনাথ বলেন, আত্মার আহুতি দিয়া মৃতকে বাঁচানোই ভারতের কাম্য। নীতি ও সত্যের আলোকে যাচাই করিয়া দেখিলে যে সকল সমস্যাকে তুচ্ছ ও মূল্যহীন বলিয়া বুঝা যায়, সেই সকল সমস্যার সমাধানে অধ্যাত্ম-শক্তির এই অপব্যয় বেদনাদায়ক। নৈতিক বলকে বলে রূপান্তরিত করা অন্যায়, অপরাধ।

যখন জাঁকজমকের সহিত অসহযোগের অভিযান শুরু হইল, এবং খিলাফত আদর্শ ও পাঞ্জাব হত্যাকাণ্ডের নামে দেশময় চাঞ্চল্য দেখা দিল, তখন রবীন্দ্রনাথ ইহাই অনুভব করিতেছিলেন। জনতা অতি সহজেই উত্তেজিত হইয়া পড়ে, এবং সময়ে সময়ে আক্রোশে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে। সুতরাং জনতার উপর এই অভিযানের ফলাফল যে কি হইবে তাহা চিন্তা করিয়াই রবীন্দ্রনাথ ভীত হইতেছিলেন। তিনি জনসাধারণের মনকে প্রতিশোধ এবং অসম্ভব সকল ক্ষতিপূরণের কল্পনা হইতে ফিরাইয়া লইতে চাহিতেছিলেন। তিনি চাহিতেছিলেন এই অপূরণীয় ক্ষতির কথা জনসাধারণ ভুলিয়া যাক, তাহারা তাহাদের সকল শক্তি ও সাধনা দিয়া ভারতের জন্যে এক অভিনব আত্মা গড়িয়া তুলুক। রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজীর মতবাদ এবং তাঁহার আত্মত্যাগের তেজোময় শক্তিকে চিরদিনই প্রশংসা করিয়া আসিয়াছেন, তথাপি তাঁহার এই অসহযোগ আন্দোলনের নঙর্থক দিকটাকে ঘৃণা না করিয়া পারেন নাই। 'না' এই অর্থবোধক সবকিছু হইতেই তিনি এক স্বাভাবিক প্রেরণাবশে দূরে সরিয়া দাঁড়ান।

এই দৃঢ় বিশ্বাসের ফলেই রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্মধর্মের সদর্থক আদর্শের সহিত বৌদ্ধধর্মের নঙর্থক আদর্শের তুলনা করিয়াছেন। ব্রাহ্মধর্ম জীবনের সকল আনন্দকে শুদ্ধ করিয়া গ্রহণ করিতে চাহে, কিন্তু বৌদ্ধধর্ম চাহে জীবনের সকল আনন্দকে দমন করিতে।[৫৫] ইহার উত্তরে গান্ধীজী বলেন, গ্রহণ-কলার মতোই গুরুত্বপূর্ণ এই বর্জন-কলা। এই উভয়ের মিলনই মানবের প্রগতি। উপনিষদের শেষ কথা ত্যাগ। উপনিষদের রচয়িতারা ব্রাহ্মণের যে সূত্র দিয়াছেন তাহা হইল 'নেতি', 'ইহা নহে'। ভারতবর্ষ 'না' বলিবার শক্তি হারাইয়াছিল। গান্ধীজী পুনরায় তাহাকে সেই শক্তি ফিরাইয়া দিয়াছেন। আগাছা তুলিয়া ফেলা বপনের মতোই একান্ত প্রয়োজনীয়।[৫৬]

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ, স্পষ্টত, আগাছা বাদ দেওয়ায় বিশ্বাস করেন না। তাঁহার কাব্যময় জীবন-দর্শনের মধ্যে জগৎ যেমনটি আছে, তাহাকে তেমনি দেখিয়াই তিনি সন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং তাহার সঙ্গতির প্রশংসা করিয়া তিনি আনন্দ পাইয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার বক্তব্যকে অতীব সৌন্দর্যময় ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা সৌন্দর্যময়, কিন্তু ইহার সহিত জীবনের সম্পর্ক নাই। তাঁহার ভাষা যেন নটরাজের নৃত্য, প্রহেলিকার খেলা! রবীন্দ্রনাথ বলেন, সমগ্র দেশব্যাপী যে মহা উল্লাসের

---

[৫৫] ৫ই মার্চ, ১৯২১।
[৫৬] ১লা জুন, ১৯২১।

স্রোত বহিয়া চলিয়াছে, তিনি তাহার সহিত নিজের মনের সুরটিকে বাঁধিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু পারেন নাই, নিজের ইচ্ছা সত্ত্বেও অন্তরের মধ্যে তিনি বাধা পাইয়াছেন। তিনি বলেন : হতাশার অন্ধকারে মৃদু হাসি দেখিয়াছি, কন্ঠস্বর শুনিয়াছি। এই কণ্ঠস্বর বলিয়াছে, 'শিশুদের পাশেই তোমার স্থান; তুমি তাহাদের সহিত বিশ্বের বেলাভূমিতে খেলা করো। সেখানেই আমি তোমার সাথে থাকিব।' রবীন্দ্রনাথ বিশ্বের সংগীতকে লইয়াই ক্রীড়া করেন, নূতন ছন্দের রচনা করেন। রবীন্দ্রনাথের কাছে সমস্ত সৃষ্টিই আনন্দময়। পত্র, পুষ্প সবই কেবল ছন্দ—যে ছন্দের বিরাম নাই। বিধাতাপুরুষ স্বয়ং শ্রেষ্ঠতম জাদুকর, তিনি মহাকালকে লইয়া খেলা করেন, তিনি অবলীলায় দৃশ্যায়িত করেন গ্রহ-নক্ষত্রকে, তিনি স্বপ্নে-ভরা কাগজের ভেলা প্রস্তুত করিয়া সেগুলিকে ভাসাইয়া দেন অনন্ত যুগের স্রোতস্বতীতে ......রবীন্দ্রনাথ অসহযোগের কল-কোলাহলের মধ্যেও সঙ্গীতের সন্ধান করিয়াছেন। কিন্তু পান নাই। তাই তিনি স্বগত বলিয়াছেন : 'তুমি যদি তোমার স্বদেশবাসীদের ইতিহাসের পরম সংকটমুহূর্তে তাহাদের সহিত পা মিলাইয়া চলিতে না পারো, তবে সাবধান, বলিও না যে তাহারা ভুল করিয়াছে এবং তুমি নির্ভুল। তুমি সৈনিকের স্থান ছাড়িয়া কবির কোণটিতে গিয়া বসো এবং ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ও অপমান সহিবার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করো।'

গ্যেটেও এই কথাই বলিতেন। একজন ভারতীয় গ্যেটে, ব্যাক্কাস। এবং মনে হইবে, এখন হইতেই যেন রবীন্দ্রনাথ মানসলোকে ফিরিয়া আসিলেন। কর্মের মধ্যে 'না'-র দ্যোতনা রহিয়াছে, তাই রবীন্দ্রনাথ কর্মের নিকট বিদায় লইলেন, এবং নিজের চারিদিকে এক সৃষ্টির মায়ালোক রচনা করিয়া তাহার মধ্যেই সরিয়া গেলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যে কেবলমাত্র সরিয়া গেলেন তাহাই নহে। তিনি বলিয়াছেন, নিয়তি স্থির করিয়া দিল, তাঁহাকে স্রোতের বিরুদ্ধেই তরণী বাহিতে হইবে। ঐ সময় তিনি কেবল 'কবি'ই ছিলেন না, তিনি ছিলেন এশিয়ার অধ্যাত্ম দূত—ইউরোপের নিকট। সেই সবেমাত্র তিনি ইউরোপ হইতে ফিরিয়াছেন। ইউরোপের জনসাধারণকে শান্তিনিকেতনে এক বিশ্ববিদ্যালয় সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সহযোগিতার জন্য অনুরোধ করিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু নিয়তির এমনই পরিহাস যে, তিনি যখন পৃথিবীর এক প্রান্তে প্রাচ্য এবং প্রতীচ্যের সহযোগিতার বাণী প্রচার করিতেছেন, ঠিক তখনই সেই মুহূর্তে, পৃথিবীর অন্য প্রান্তে প্রচারিত হইতেছে অসহযোগের বাণী!

সুতরাং অসহযোগ রবীন্দ্রনাথকে দুই ভাবে আঘাত করিল, তাঁহার কর্মে এবং জীবন সম্পর্কে তাঁহার ধারণায়। তিনি বলেন, প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের সত্যিকারের মিলনে তিনি বিশ্বাসী। অসহযোগের সহিত তাঁহার চিন্তাধারার সংঘর্ষ বাধিল। কারণ, তাঁহার সমৃদ্ধ বুদ্ধি এবং মন, সমগ্র পৃথিবীর সংস্কৃতির রসে পুষ্ট। রবীন্দ্রনাথ বলেন, সমস্ত মানবতায় যাহাই শ্রেষ্ঠ, তাহাই আমার। মানবজাতির এই মহাসঙ্গীতির মধ্য হইতেই কেবলমাত্র মানুষের অনন্ত ব্যক্তিত্বের (উপনিষদে যাহার উল্লেখ আছে) উদ্ভব হইতে পারে। পৃথিবীর জনসাধারণের সহযোগিতা যেন ভারতের

মধ্য দিয়া প্রকাশ লাভ করে, ইহাই আমি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি। ভারতের পক্ষে, মিলনই সত্য, ভেদই অসত্য। মিলন হইল তাহাই, যাহা সবকিছুই বোধ করে, গ্রহণ করে। সুতরাং ইহা বর্জনের দ্বারা লাভ করা সম্ভব নহে। প্রতীচ্য হইতে আমাদের অধ্যাত্ম জীবনকে বিচ্ছিন্ন করার বর্তমান চেষ্টা আধ্যাত্মিক আত্মহত্যারই চেষ্টা মাত্র।...বর্তমান যুগে পাশ্চাত্যের প্রাধান্য ঘটিয়াছে। কারণ, পূর্ণ করিবার মতো একটি আদর্শ পাশ্চাত্যে রহিয়াছে। প্রাচ্যের আমাদিগকে পাশ্চাত্যের নিকট শিখিতে হইবে। অবশ্য ইহা দুঃখের বিষয় যে, আমরা আমাদের স্বকীয় সংস্কৃতিকে গ্রহণ করিবার শক্তি হারাইয়াছি, তাই আমরা পাশ্চাত্য সভ্যতাকে তাহার নির্দিষ্ট স্থানে বসাইতে পারিতেছি না; কিন্তু পাশ্চাত্যের সহিত সহযোগিতাকে অন্যায় বলার অর্থ হইল হীনতম সংকীর্ণতাকে প্রশ্রয় দেওয়া এবং মানসিক ক্লৈব্যের উদ্ভব করা। এই সমস্যা হইল সমগ্র বিশ্বের সমস্যা। কোনো জাতিই অন্যান্য জাতি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আপনার মুক্তির পথ খুঁজিয়া পাইতে পারে না। হয় আমরা সকলেই একত্রে রক্ষা পাইব, নয়, সকলেই একত্রে ধ্বংস হইব।[৫৭]

অর্থাৎ, ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে গ্যেটে যেমন ফরাসী সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে বর্জন করিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন, রবীন্দ্রনাথও তেমনি পাশ্চাত্য সভ্যতাকে নির্বাসিত করিতে অস্বীকার করিলেন। গান্ধীজীর মতবাদ বাস্তবিক পক্ষে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মধ্যে কোনো বাধার সৃষ্টি না করিলেও, রবীন্দ্রনাথ জানিতেন যে, একবার হিন্দু জাতীয়তা জাগিলে তাহা এই ভাবেই ব্যাখ্যাত হইবে। বর্জনের মনোভাব ক্রমেই বাড়িয়া উঠিতে পারে, রবীন্দ্রনাথ ইহাই ভয় করিতেছিলেন। অসহযোগ আন্দোলনের গোড়ার দিকে যখন তাঁহার ছাত্ররা এ বিষয়ে তাঁহার পরামর্শ চাহিল, তখন রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সংশয় ও উদ্বেগের কথা বুঝাইয়া দিলেন। স্কুল ও কলেজ বয়কটের অর্থ কি?—রবীন্দ্রনাথ এই প্রশ্ন করেন। "ছাত্ররা ত্যাগ স্বীকার করিবে—কিন্তু কিসের জন্য? পূর্ণতর কোনো শিক্ষার জন্য নহে, অশিক্ষার জন্য।" প্রথম স্বদেশী আন্দোলনের[৫৮] সময় একদল তরুণ ছাত্র রবীন্দ্রনাথকে বলিয়াছিল যে, তাহারা যদি তাঁহার আদেশ পায়, তবে অবিলম্বে স্কুল-কলেজ ত্যাগ করিবে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এইরূপ আদেশ দিতে অস্বীকার করেন। ফলে, ছাত্ররা তাঁহার উপর অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া, তাঁহার দেশপ্রীতিকে সন্দেহ করিয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করে।

১৯২১-এর বসন্তকালে ভারত যখন ইংরেজী স্কুলগুলি বয়কট করিল, রবীন্দ্রনাথ তখন লন্ডনে এক আক্রমণশীল সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদের দৃষ্টান্ত প্রত্যক্ষ করিলেন। রবীন্দ্রনাথের অন্যতম বন্ধু অধ্যাপক পিআর্সনের এক বক্তৃতার সময় কতিপয় ভারতীয় ছাত্র তাহাদের জাতীয়তাবাদের অপ্রাসঙ্গিক প্রকাশ করিয়া বসে। রবীন্দ্রনাথ রুষ্ট হইয়া শান্তিনিকেতনের পরিচালককে লেখা এক চিঠিতে ছাত্রদের এই অসহিষ্ণু মনোভাবের তীব্র নিন্দা করেন এবং তিনি অসহযোগ

[৫৭] ১৩ই মার্চ, ১৯২১-এর নভেম্বরে মডার্ন রিভিউতে পরিবর্ধিত হইয়া প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত।

[৫৮] প্রথম ভারতীয় স্বদেশী আন্দোলন—বাংলায়, ১৯০৭-৮ খ্রীষ্টাব্দে।

আন্দোলনকেই এজন্য দায়ী করেন। এই অভিযোগের উত্তরে গান্ধীজী বলেন :

"আমি আমার গৃহের চারিদিকে প্রাচীর তুলিবার সময় গৃহের বাতায়ন পথগুলি রুদ্ধ করিতে চাহি না। সকল দেশের সংস্কৃতির হাওয়া যথাসম্ভব মুক্তভাবে আমার গৃহে বহিয়া আসুক, আমি তাহাই চাই...কিন্তু এই হাওয়ার ঝড়ে আমি উড়িয়া যাইতে রাজী নহি।...কারাগারের ধর্ম আমার নহে। ভগবানের সামান্যতম সৃষ্টিরও ইহার মধ্যে স্থান আছে। কিন্তু ইহাতে কোন জাতির, কোন ধর্মের, বা কোন বর্ণের উদ্ধত স্পর্ধার প্রবেশ-পথ নাই।"[৫৯]

ইংরেজী সাহিত্যিক শিক্ষার সদ্‌গুণ সম্পর্কে গান্ধীজী সন্দেহ প্রকাশ করেন, বলেন, চরিত্র-গঠনের সহিত ইহার কোন সম্পর্ক নাই। তাঁহার মতে, ইহা ভারতীয় যুবকদের পৌরুষ নষ্ট করিয়াছে। তথাপি গান্ধীজী এই সকল উল্লিখিত বাড়াবাড়ির জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন এবং রবীন্দ্রনাথ যেমন ইঙ্গিত করিয়াছেন মনে হয়, নিজের মনোভাব সেরূপ সংকীর্ণ নহে বলিয়াই দাবি করেন।

গান্ধীজীর কথাগুলি যথার্থ এবং অকপট। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ভয় দূর হইল না। তিনি গান্ধীজীকে সন্দেহ করিতেছিলেন না, তিনি ভয় করিতেছিলেন গান্ধীবাদীদিগকে। দেশের জনসাধারণ গান্ধীজীর কথাগুলিকে যেরূপ অন্ধ-বিশ্বাসের সহিত গ্রহণ করিতেছে, রবীন্দ্রনাথ ইউরোপ হইতে ফিরিবার পর জনসাধারণের সহিত প্রথম সম্পর্কে আসিয়াই লক্ষ্য করিলেন ও ভীত হইয়া উঠিলেন। রবীন্দ্রনাথ দেখিলেন, মানসিক স্বৈরশাসনের বিপদ আসন্ন। তাই তিনি ১৯২১-এর অক্টোবরে মডার্ন রিভিউ পত্রিকায় 'এ্যান অ্যাপিল টু ট্রুথ' নামে বাস্তবিক পক্ষে এক ফতোয়া প্রকাশ করিলেন। এই ফতোয়ায় অন্ধ আনুগত্যের বিরুদ্ধে তিনি বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। এই প্রতিবাদটি বিশেষভাবে বলিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল, কারণ, প্রতিবাদের পূর্বেই ছিল গান্ধীজীর সুন্দর একটি প্রশস্তি। ১৯০৮ সালের প্রথম ভারতীয় স্বাধীনতা-আন্দোলন বর্ণনা করিবার পর রবীন্দ্রনাথ ব্যাখ্যা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, তখনকার রাজনীতিক নেতারা বার্ক, গ্ল্যাডস্টোন, ম্যাৎসিনি, গ্যারিবল্ডি প্রভৃতির ঐতিহ্য অনুসারে কেতাবী আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইতেন এবং তাঁহাদের বাণীও অল্পসংখ্যকমাত্র শিক্ষিত ব্যক্তিদের বোধগম্য হইত। অর্থাৎ সংক্ষেপে বলা যায়, তাঁহারা এক ইংরেজি-ভাষিত আদর্শ আগাইয়া ধরিয়াছিলেন! কিন্তু তাহার পর আসিলেন মহাত্মা গান্ধী। তিনি তাঁহাদেরই একজনের মতো পোশাক পরিয়া সহস্র সহস্র বিত্তহীনের কুটির-প্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাহাদের সহিত তিনি আলাপ করিলেন তাহাদেরই ভাষায়। অবশেষে, কেবল কেতাবী উদ্ধৃত বচন নহে, সত্যের উদয় হইল। মহাত্মা—ভারতের জনসাধারণ তাঁহাকে যে নাম দিয়াছে,—তাহাই তাঁহার সত্যিকারের নাম হইল। তিনি ছাড়া আর কে জনসাধারণের সহিত এমন অন্তরঙ্গ হইয়া অনুভব করিতে পারিয়াছে? আর কে অনুভব করিতে পারিয়াছে যে, জনসাধারণই তাঁহার দেশের রক্তমাংস। গান্ধীজীর আহ্বানে আত্মার

[৫৯] ১৯২১, ৫ই মার্চ।

সকল গোপন শক্তিই বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে; কারণ, গান্ধীজীই সত্যকে স্পর্শ-গোচর ও দৃষ্টিগোচর করিয়া তুলিয়াছেন। এমনি ভাবেই, হাজার হাজার বৎসর আগে বুদ্ধের আহ্বানে ভারতবর্ষ এক অভিনব মহিমায় বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল। মানুষকে বুদ্ধ শিখাইয়াছিলেন সকল জীবিতের প্রতি করুণা এবং মৈত্রীর কথা। ভারতবর্ষ নূতন জীবনে চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার শক্তি প্রকাশ পাইয়াছিল বিজ্ঞানে, সম্পদে; তাহা ছড়াইয়া পড়িয়াছিল মহাসাগর, মহামরু পার হইয়া। কোন বাণিজ্যিক, কোন সামরিক বিজয়ই কখনো এমন মহিমান্বিত হইয়া ছড়াইয়া পড়ে নাই। কারণ, প্রেমই একমাত্র সত্য।

কিন্তু এবার রবীন্দ্রনাথের সুরও বদলাইল। স্তব্ধ হইল স্তুতি। রবীন্দ্রনাথ ইউরোপে থাকিয়াই সাত সমুদ্র পারে ভারতের নব জাগরণের স্পন্দন অনুভব করিতেছিলেন। তাই রোমাঞ্চিত হইয়া স্বাধীন ভারতের মুক্ত বায়ুতে নিঃশ্বাস লইবার প্রত্যাশায় তিনি দেশে ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু প্রত্যাবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার আনন্দ তিরোহিত হইল। তিনি দেখিলেন, শাসনের এক আবহাওয়া সমস্ত জনসাধারণকে চাপিয়া আছে। "বাহিরের কোনো প্রভাব যেন তাহাদের উপর নামিয়া আসিয়াছে, তাহাদিগকে পিষিয়া দিতেছে, তাহাদিগকে একত্রে পিণ্ডাকৃতি করিয়া একই সুরে কথা বলিতে বাধ্য করিতেছে; তাহারা যেন একই পথে গড়াইয়া চলিয়াছে। সর্বত্রই আমি শুনিলাম, সংস্কৃতি এবং যুক্তি ত্যাগ করিতে হইবে, থাকিবে কেবল মাত্র অন্ধ আনুগত্যের শাসন। কোন বাহিরের স্বাধীনতার নামে আত্মার বাস্তবিক মুক্তিকে পিষিয়া মারা কতোই না সহজ!"

রবীন্দ্রনাথের সংশয়-ভীরুতা এবং আবেদন আমরা বুঝিতে পারি। সেগুলি চিরকালের, চিরযুগের। সে হইল নব খ্রীষ্টান ধর্মের প্রত্যূষে ধ্বংসমান পুরাতন পৃথিবীর শেষ মুক্ত মনের বাণী। যখনই আমরা কোনো সমাজীয় বা জাতীয় আদর্শে অন্ধবিশ্বাসের স্রোতকে স্ফীত হইয়া উঠিতে দেখি, তখনই আমাদের মধ্যে এই সংশয় ও ভীতি আমরা অনুভব করি। রবীন্দ্রনাথের এই বিদ্রোহ বন্ধ যুগের পুরাতন স্থাবির বিশ্বাসের বিরুদ্ধে মুক্তাত্মার বিদ্রোহ। কারণ, মুষ্টিমেয় শ্রেষ্ঠ কয়েকজন মানুষের কাছে বিশ্বাসের অর্থ পরমতম মুক্তি হইলেও জনসাধারণ, যাহারা এই বিশ্বাসের বশে পরিচালিত হয়, তাহাদের কাছে এই বিশ্বাসের অর্থ এক-প্রকার দাসত্ব মাত্র।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সমালোচনা বিশ্বাস-উন্মত্ত জনতার উর্ধ্বে লক্ষ্য করিয়াছেন। ইহা অন্ধ জনতার উপর দিয়া মহাত্মাকে গিয়া লাগিয়াছে। মহাত্মা যতই মহান হোন না কেন, একটি মানুষের পক্ষে বহনীয় যাহা, তাহার অপেক্ষা অনেক গুরুভার বোঝা কি তিনি গ্রহণ করিতেছেন না? ভারতের আদর্শের মতো একটি মহা আদর্শকে একটি মাত্র মানুষের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল করা উচিত হইবে না। মহাত্মা সত্য ও প্রেমের অধিকারী, কিন্তু ভারতের স্বরাজ লাভ যেমনই বিরাট, তেমনই জটিল। এই পথ জটিল ও দুর্গম। ভাবাবেশ এবং উৎসাহের প্রয়োজন আছে। কিন্তু সেই সঙ্গে বিজ্ঞান এবং বুদ্ধিরও প্রয়োজন। জাতির সমস্ত নৈতিক শক্তিকে নিয়োগ

করিতে হইবে। অর্থনীতিকরা ব্যবহারিক সমাধান খুঁজিবেন। শিক্ষকরা শিক্ষা দিবেন, রাষ্ট্রবিদ্‌রা চিন্তা করিবেন, কর্মীরা করিবেন কাজ।......সর্বত্রই শিক্ষার অভিলাষকে মুক্ত এবং অব্যাহত রাখিতে হইবে। প্রকাশ্য বা গোপন বুদ্ধির কোনো প্রকার শাসনই চলিবে না। রবীন্দ্রনাথ বলেন, অতীতকালে আদিম অরণ্যে আমাদের ঋষিরা গুরুরা তাঁহাদের সত্য দৃষ্টির প্রাচুর্যে সকলকেই সত্যের সন্ধানের জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন।...তবে আজ আমাদের গুরু, যিনি কর্মে আমাদিগকে পথ দেখাইতে চান, তিনিও তেমনি ভাবেই আমাদিগকে আহ্বান করেন না কেন? আজ পর্যন্ত গুরু গান্ধী যে একমাত্র আদেশ দিয়াছেন, তাহা হইল, "সুতো কাটো আর কাপড় বোনো।" তাই রবীন্দ্রনাথ প্রশ্ন করেন, "নূতন সৃষ্টির যুগের এই কি বাণী? যদি বড়ো যন্ত্রগুলি পাশ্চাত্যে বিপদের কারণ হইয়া থাকে, তবে ছোট যন্ত্রগুলি কি আমাদের আরো বড় বিপদের কারণ হইয়া উঠিবে না? জাতির বিভিন্ন শক্তির কেবল নিজেদের মধ্যেই সহযোগিতা করিলে চলিবে না, সহযোগিতা করিতে হইবে জাতিতে জাতিতে, দেশে দেশে। ভারতের জাগরণ সমগ্র বিশ্বের জাগরণের সহিত একই সূত্রে আবদ্ধ। প্রত্যেকটি জাতি, যে নিজেকে অন্যান্য জাতি হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া অবরুদ্ধ রাখিয়াছে, সে-ই নূতন যুগের চেতনাকে আঘাত করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ যিনি কয়েক বৎসর ইউরোপে কাটাইয়াছেন, ইউরোপে তাঁহার সহিত যাঁহাদের সাক্ষাৎ হইয়াছে, তাঁহাদের কয়েকজনের উল্লেখও তিনি করেন। ইঁহারাই সমগ্র মানবতার সেবা করিবার উদ্দেশ্যে জাতীয়তার শৃঙ্খল-বন্ধন হইতে আপনাদের হৃদয়কে মুক্ত করিয়াছেন। ইঁহারাই নির্যাতিত সংখ্যাল্প বিশ্বনাগরিক। রবীন্দ্রনাথ ইঁহাদের বলেন সন্ন্যাসী অর্থাৎ যাঁহারা নিজেদের আত্মার মধ্যে সমগ্র মানবতার মিলন উপলব্ধি করিয়াছেন।

তাই রবীন্দ্রনাথ প্রশ্ন করেন, কেবল ভারতই কি তবে একা বর্জনের ও অধিকারের অধ্যায় আওড়াইবে? চিরদিন অন্যের ত্রুটি লইয়া আলাপ করিবে? ঘৃণার উপর ভিত্তি করিয়া স্বাধীনতার সংগ্রাম করিবে? প্রত্যূষে যখন পাখীর ঘুম ভাঙে, তখন সে কেবল আহারের কথাই ভাবে না। তাহার পাখা আকাশের আহ্বানে সাড়া দেয়। আগামী দিনকে নন্দিত করিতে তাহার কণ্ঠ আনন্দের গানে ভরিয়া উঠে। ভারত তাহার স্বকীয় ধারাতেই উত্তর দিক। ঊষাকালে আমাদের প্রধান কর্তব্য তাঁহাকেই স্মরণ করা, যিনি তাঁহার বিচিত্র শক্তি দ্বারা প্রয়োজনমতো সকল শ্রেণীর সকলের প্রয়োজন মিটাইয়া থাকেন। আসুন, আমরা তাঁহার উপাসনা করি, যিনি আমাদিগকে জ্ঞান দান করেন, যিনি বুদ্ধির দ্বারা আমাদের সকলকে মিলিত করেন।

রবীন্দ্রনাথের সুন্দর এই কথাগুলি, এ যেন সূর্যালোকের কবিতা! মানুষের সংগ্রামের ঊর্ধ্বে ইহার স্থান। এই কথাগুলিকে কেবলমাত্র এই বলিয়া তিরস্কার করা চলে যে, এগুলির স্থান অতি বেশী ঊর্ধ্বে। চিরন্তনের দিক হইতে রবীন্দ্রনাথ নির্ভুল। এই বাণী-বিহঙ্গ, ঈগল-পক্ষীর মতো সুবৃহৎ এই লার্ক—কবি হাইনে যেমন আমাদের এক শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতকারকে বলিয়াছিলেন—ইনি কালের ধ্বংস-স্তূপের উপর বসিয়া গান করেন। ইনি বাঁচিয়া থাকেন সনাতনের মধ্যে। কিন্তু বর্তমানের

দাবিকেও তো অস্বীকার করিবার উপায় নাই।[৬০] প্রতিটি মুহূর্ত, যাহা চলিয়া যাইতেছে, তাহা ত্রুটিহীন না হইলেও, অবিলম্বে সাহায্যের দাবি করে, চিৎকার করে। এই দিক হইতে গান্ধীজী, রবীন্দ্রনাথের মতো যাঁহার সেই কাব্যময় ঊর্ধ্ব-লোকগতির ক্ষমতা নাই, (কিংবা হয়তো যিনি করুণার বোধিসত্ত্বের মতো সর্বহারাদের মধ্যে বাসের উপযুক্ত হইবার কামনায় সেই ক্ষমতা ত্যাগ করিয়াছেন), তিনি রবীন্দ্রনাথের এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়াকে শিশুর ক্রীড়া বলিয়াই ভাবিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথের প্রশ্নের উত্তরে গান্ধীজী যে আবেগ দেখাইয়াছেন, তেমনটি ইতিপূর্বে তাঁহাদের বাদ-বিতর্কে প্রকাশ পায় নাই। ১৯২১-এর ১৩ই অক্টোবরের ইয়ং ইন্ডিয়ায় তাঁহার এই চাঞ্চল্যকর জবাব প্রকাশিত হয়। সম্মুখে অজ্ঞাত বিপদ সম্পর্কে ভারতকে সতর্ক করিয়া দেওয়ার জন্যে গান্ধীজী এই 'মহা প্রহরীকে'[৬১] ধন্যবাদ জানান। তিনি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে একমত হন যে, স্বাধীন মনোভাব বজায় রাখাই হইল মূল কথা।

"আমাদের যুক্তিকে আমরা কখনো কাহারো হাতে তুলিয়া দিব না। প্রেমের কাছে অন্ধ আত্মসমর্পণ অত্যাচারীর চাবুকের কাছে বাধ্য হইয়া আত্মসমর্পণ অপেক্ষা অধিক ক্ষতিকর। পুলিশী জুলুমের কাছে যাহারা গোলামি করে, তাহাদের আশা আছে, কিন্তু প্রেমের কাছে যাহারা গোলামি করে, তাহাদের কোনো আশাই নাই।"

রবীন্দ্রনাথ সেই পুরোরক্ষী, যিনি কুসংস্কার, আলস্য, অসহিষ্ণুতা, অজ্ঞানতা এবং নির্জীবতা নামক আসন্ন শত্রু-বাহিনীর বিরুদ্ধে সতর্ক করিয়া দেন। কিন্তু তাঁহার এই সন্দেহ ও ভয় ন্যায়সঙ্গত বলিয়া গান্ধীজী মনে করেন না। গান্ধীজী সর্বদাই যুক্তির আশ্রয় লন। ভারতবর্ষ কেবলমাত্র অন্ধ আনুগত্যের ফলেই আগাইয়া চলিয়াছে, একথা সত্য নহে। দেশ যদি চরকা গ্রহণের সিদ্ধান্ত করিয়াছে, তাহা প্রচুর চিন্তা ও আলোচনার পরই করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ ধৈর্যের কথা বলেন। তিনি সুন্দর সঙ্গীত লইয়াই সন্তুষ্ট থাকেন। কিন্তু সংগ্রামও যে রহিয়াছে। কবির বীণা এখন নীরব রাখিতে হইবে। সংগ্রাম যখন শেষ হইবে, তখন আবার তিনি তাঁহার বীণা তুলিয়া লইবেন। গৃহে যখন আগুন লাগে, তখন প্রত্যেকেরই বাহিরে আসিতে হইবে, প্রত্যেককেই আগুন নিভাইবার জন্য জলের কলসী তুলিয়া লইতে হইবে।

"আমার চারিদিকে যখন খাদ্যের অভাবে মানুষ মরিতেছে, তখন আমার কর্তব্য হইল বুভুক্ষুকে অন্ন দান করা। ভারতবর্ষ সেই গৃহ, যাহাতে আগুন লাগিয়াছে। ইহা ক্ষুধায় মরিতেছে। কারণ, খাদ্য কিনিবার মতো মানুষের হাতে কাজ নাই। খুলনা অনাহারে রহিয়াছে। পরিত্যক্ত জিলাগুলি এই চতুর্থবার দুর্ভিক্ষে পা দিয়াছে। উড়িষ্যা স্থায়ী দুর্ভিক্ষে ভুগিতেছে। দিনে দিনে ভারতবর্ষ দরিদ্র হইতে দরিদ্রতর হইয়া পড়িতেছে। ভারত যে পায়ের উপর দাঁড়াইয়া আছে, তাহার রক্তচলাচল একরকম বন্ধ হইয়া আসিল। আমরা যদি সাবধান না হই, তবে সমগ্র দেহ ভাঙিয়া পড়িবে।

---

৬০ উপনিষদের প্রথম ছত্রের গদ্যানুবাদ।

৬১ ১৯২১-এর ১৩ই অক্টোবরের লিখিত প্রবন্ধের নাম 'গ্রেট সেণ্টিনেল'।

ক্ষুধিত ও কর্মহীন জনসাধারণের কাছে ভগবান যে রূপে অবতীর্ণ হইতে সাহস করেন, তাহা হইল কাজ এবং বেতনের রূপে খাদ্যের অঙ্গীকার। নিজের খাদ্যের জন্য কাজ করিতে ভগবান মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন, এবং মানুষকে তিনি বলিয়াছিলেন, যাহারা কাজ না করিয়া অন্ন গ্রহণ করে, তাহারা তস্কর। আজ যে লক্ষ লক্ষ মানুষ পশুরও অধিক হইয়া মরিতেছে, তাহাদের কথা আমাদের ভাবিতেই হইবে। ক্ষুধাই একমাত্র যুক্তি যাহা ভারতবর্ষকে চরকার দিকে টানিয়া আনিয়াছে।

আগামী কালের জন্য কবি বাঁচিয়া থাকেন, আমরাও সবাই আগামী কালের জন্যে বাঁচিয়া থাকি তাহাই তিনি চান। তিনি আমাদের প্রশংসমান চক্ষুর সম্মুখে একটি পাখীর সুন্দর ছবি ধরিয়াছেন,—যে পাখী ঊষাকালে বন্দনাগান গাহিতে গাহিতে আকাশে ঊর্ধ্ব হইতে ঊর্ধ্বতর লোকে ভাসিয়া চলিয়াছে। ঐ পাখীর দিনের আহার আছে। বিগত রাত্রির বিশ্রাম তাহাদের পাখায় দিয়াছে তাজা নূতন রক্তের প্রবাহ, তাই তাহারা উল্লাসিত পাখায় ভর করিয়া ঊর্ধ্বলোকে প্রয়াণ করিতেছে। কিন্তু আমি বেদনা-বিহ্বল চিত্তে দেখিতেছি, মানব-পক্ষীদের শক্তি নাই, সামর্থ্য নাই, শত সোহাগেও তাহারা পাখা নাড়ে না। ভারতের আকাশের এই মানব-পক্ষীর দল যখন রাত্রিতে বিশ্রামের ভান করে, এবং প্রভাতে আবার উঠিয়া দাঁড়ায় তখন তাহারা আগের অপেক্ষাও আরো দুর্বল হইয়া পড়ে। কোটি কোটি মানুষের এ যেন অনন্ত জাগরণ, অনন্ত মূর্ছা! আমি কবীরের গান গাহিয়াও পীড়িত দুঃস্থদের বিন্দুমাত্রও স্বস্তি দিতে পারি নাই!...

তাহাদিগকে কাজ দিতে হইবে, যাহাতে তাহারা খাইতে পায়। প্রশ্ন আসিতে পারে, আমি কেন সুতা কাটিতে যাইব, যাহার আহারের জন্যে কাজ করিবার কোনো প্রয়োজন হয় না? কাজ করিব, কারণ যাহা আমার নহে, আমি তাহাই গ্রহণ করিতেছি, আমার দেশবাসীর সম্পত্তি আত্মসাৎ করিয়া আমি বাঁচিয়া আছি। আপনার পকেটে যে মুদ্রা আসে, তাহার প্রত্যেকটির কারণ অনুসন্ধান করুন। তাহা হইলেই আপনি আমার লেখার সত্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। প্রত্যেককেই সুতা কাটিতে হইবে। অন্যের মতো রবীন্দ্রনাথ-ও সুতা কাটুন। তিনি তাঁহার বিলাতী পোশাক পোড়াইয়া ফেলুন। তাহাই আজ কর্তব্য। আগামী কালের ব্যবস্থা বিধাতা করিবেন। যেমন গীতা বলিয়াছে, "ন্যায় পালন কর!"

মর্মান্তিক বেদনাময় এই কথাগুলি। এখানে আমরা দেখিতে পাই বিশ্বের যতো দারিদ্র্য দুঃখ বেদনা শিল্পীর স্বপ্নের সম্মুখে মাথা তুলিয়া আর্তনাদ করিয়া বলিতেছে, "আমার অস্তিত্ব অস্বীকার করিতে দুঃসাহস করো!" গান্ধীজীর এই ভাবাবেগের প্রতি কাহার না দরদ আছে, কে-ই বা ভাবাবেগে অংশ গ্রহণ না করে? তথাপি তাঁহার এই কঠিন, তিক্ত উত্তরের মধ্যেও এমন কিছু রহিয়াছে, যাহা রবীন্দ্রনাথের সন্দেহের ন্যায্যতা প্রমাণ করে। আদর্শের অনিবার্য শৃঙ্খলা মানিবার জন্য যাহাকেই আহ্বান করা হইতেছে, তাহার উপর নীরব থাকিবার আদেশ পড়িতেছে। আলোচনা না করিয়া স্বদেশীর আইন মানিয়া চল—যে স্বদেশীর প্রথম

আদেশ হইল, সূতা কাটো।

মানব-সংগ্রামে শৃঙ্খলা-রক্ষা যে একটি কর্তব্য, তাহা নিঃসন্দেহ। কিন্তু দুঃখের বিষয়, যাহাদের উপর এই শৃঙ্খলারক্ষাকে কার্যকরী করিবার ভার থাকিবে, প্রভুর সেই চেলারা তো সংকীর্ণচেতা হইতেই পারেন। তাঁহারা আদর্শে পৌঁছিবার জন্যে নিয়োজিত শৃঙ্খলাকেই আদর্শ বলিয়া ভুল করিতে পারেন। কঠোরতার কারণেই শৃঙ্খলা তাঁহাদের ভালো লাগে, কারণ, সঙ্কীর্ণ ধরা-বাঁধা পথে চলিতে তাঁহারা পছন্দ করেন। তাঁহারা স্বদেশীকেই মূলকথা বলিয়া ভাবেন। তাঁহাদের কাছে স্বদেশী একটি উদ্দেশ্য পূরণের উপায় মাত্র নহে,—স্বদেশীই উদ্দেশ্য। তাঁহাদের চোখে ইহা এক প্রকার পবিত্র ব্যাপার হইয়া উঠে।

গান্ধীজীর শিষ্যদের অন্যতম, গান্ধীজীর আদর্শের প্রায় অনুরূপ বিদ্যালয় আমেদাবাদের শবরমতীর সত্যাগ্রহ আশ্রমের অধ্যাপক মিঃ ডি. বি. কালেলকর একটি 'স্বদেশীর বাণী' রচনা করিয়াছেন। গান্ধীজী এই পুস্তকের মুখপত্র লিখিয়া স্বীয় সমর্থনের ছাপও দিয়াছেন। পুস্তকখানি, পুস্তিকা বলাই ভালো, সাধারণ লোকের উদ্দেশ্যে লিখিত। এই পুস্তকে যে নীতি-সূত্রগুলির শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে, সেগুলি লক্ষ্য করিয়া দেখা প্রয়োজন। কারণ, এই শিক্ষক তাঁহাদেরই একজন, যাঁহারা গান্ধীজীর মতবাদকে তাহার অনাবিল উৎস-মুখেই পান করিয়াছেন।

"মধ্যে মধ্যে জগৎকে ত্রাণ করিবার জন্য ভগবান এই পৃথিবীতে আবির্ভূত হন। তাঁহার এই আবির্ভাব যে মনুষ্য-দেহেই সকল সময়ে ঘটিবে, এমন কোনো কথা নাই।...তিনি কোন নীতি বা কোন আদর্শ, যাহা পৃথিবীকে সমুন্নত করে, তাহার মধ্যেও আত্মপ্রকাশ করিতে পারেন।...স্বদেশী বাণীর মধ্যেই তাঁহার সাম্প্রতিক আবির্ভাব ঘটিয়াছে।"

প্রচারক উপলব্ধি করিয়াছেন যে, স্বদেশীকে যদি কেবলমাত্র বিলাতী দ্রব্যের বয়কট-রূপেই ব্যাখ্যা করা যায়, তবে এই বিবৃতিতে লোকে হাসিতেও পারে। ইহা কেবল স্বদেশীর আংশিক ব্যবহার মাত্র। স্বদেশী হইল "এক বিপুল ধর্মের সূত্র, যাহা পৃথিবীকে ঘৃণা ও দ্বন্দ্বের হাত হইতে রক্ষা করিবে, মানুষকে মুক্ত করিবে।" ইহার সারমর্ম ভারতীয় শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়।

"তোমার আপনার ধর্ম, অর্থাৎ, তোমার আপনার ধর্মের লক্ষ্য বা মোক্ষ—নিখুঁত না হইতে পারে, তবু তাহা শ্রেষ্ঠ। যে ধর্মের পালনের জন্য তোমার সৃষ্টি হয় নাই, তাহা পালনের পথ সর্বদাই বিপদাকীর্ণ। আপনার কর্তব্যকর্ম যিনি করেন, তিনিই সুখের অধিকারী হন।"

ভগবানে বিশ্বাস হইতেই স্বদেশীর মূলনীতির উদ্ভব হইয়াছে—ভগবান, "যিনি অনাদি অনন্ত কাল ধরিয়া জগতের সুখের ব্যবস্থা করিয়া আসিয়াছেন, এই ভগবানই প্রত্যেক মানুষকে তাহার কর্তব্য পালনের সর্বাপেক্ষা উপযোগী পরিবেশেই স্থাপন করিয়াছেন। মানুষের কর্তব্য এবং আশা-আকাঙ্ক্ষা পৃথিবীতে তাহার নিজের অবস্থা অনুসারেই হওয়া উচিত। আমরা যেমন আমাদের জন্ম, পরিবার ও দেশ নির্বাচন করিতে পারি না, তেমনি পারি না আমাদের সংস্কৃতিকে। ভগবান আমাদের

যাহা দিয়াছেন, তাহা আমাদের গ্রহণ করিতেই হইবে। আমরা আমাদের ঐতিহ্যকে ভগবানের নিকট হইতে প্রেরিত বলিয়াই গ্রহণ করিব এবং সেই অনুসারে বাঁচিয়া থাকাকেই আমাদের কঠিন কর্তব্য বলিয়া ভাবিব।”

এই যুক্তিগুলি হইতে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, এক দেশের অধিবাসী অন্য দেশের অধিবাসীদের লইয়া আপনাদের ব্যস্ত করিবে না।

‘স্বদেশীর অনুচর যাঁহারা, তাঁহারা সমগ্র পৃথিবীকে সংস্কৃত করিবার চেষ্টার বৃথা দায়িত্ব কখনো গ্রহণ করিবেন না। কারণ, তাঁহারা জানেন যে, ভগবানের নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসারেই পৃথিবী চলে, চিরদিন চলিবে। এক দেশের মানুষ অন্য দেশের প্রয়োজন মিটাইবে এমনটি, এমন কি মানব-কল্যাণের যুক্তি দিয়াও কেহ প্রত্যাশা করিতে পারে না। এবং তাহা সম্ভব হইলেও বাঞ্ছনীয় হইত না।......স্বদেশীর সত্যকারের অনুসরণকারী যাঁহারা, প্রত্যেক মানুষ যে তাঁহাদের ভাই, একথা তাঁহারা ভুলেন না। কিন্তু একথাও ভুলেন না যে, এক বিশেষ পরিবেষ্টনের মধ্যে তাঁহাদিগকে যে কর্তব্যসাধনের ভার দেওয়া হইয়াছে, তাহাই তাঁহাদিগকে পূরণ করিতে হইবে। যে শতাব্দীতে আমরা জন্মিয়াছি, সেই শতাব্দীর মধ্যেই যেমন আমাদের মুক্তিলাভের জন্যে কর্তব্য আমাদের সম্পন্ন করিতে হইবে, তেমনি যে দেশে আমরা জন্মিয়াছি, আমাদিগকে সেই দেশেরই সেবা করিতে হইবে। আমাদের আত্মার মুক্তি ধর্মের মধ্য দিয়া এবং আমাদের নিজেদের সংস্কৃতির মধ্য দিয়াই আমরা অনুসন্ধান করিব।”

যাহাই হউক, কোনো জাতির পক্ষে তাহার নিজস্ব বাণিজ্য ও শ্রম-শিল্পের উন্নতির জন্যে সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করা চলিবে কিনা? নিশ্চয়ই না! ভারতের কারখানাগুলিকে উন্নত করিবার ইচ্ছা একটি অপদার্থ উচ্চাশা মাত্র। ইহার দ্বারা মানুষকে তাহাদের ধর্মের অবমাননা করিতে বলা হইবে। নিজেদের দেশের মাল বাহিরে রফ্‌তানি করা যেমন অপরাধ, বাহিরের মাল দেশে আমদানি করাও তেমনি অপরাধ। এই মতবাদের যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্ত হইল—ইহা ইউরোপীয়ানদিগকে সম্ভবত চমকাইয়া দিবে—চিন্তার মতোই মাল রফ্‌তানি করাও মহাপাপ। ইতিহাসে ভারতবর্ষ যদি শোচনীয়ভাবে হীনতা স্বীকার করিয়াছে, তবে তাহার কারণ, তাহার পূর্বপুরুষরা প্রাচীন মিশর ও রোমের সহিত ব্যবসায়-বাণিজ্য করিয়া যে অপরাধ করিয়াছিলেন, তাহারই শাস্তি ঘটিয়াছে। এই প্রাচীন ভারতীয়দের উত্তরপুরুষরাও এই অপরাধটি পুনরায় বারে বারে স্বেচ্ছায় করিতেছে। প্রত্যেক জাতিকে, প্রত্যেক শ্রেণীকে, স্ব স্ব কর্তব্য মানিয়া চলিতে হইবে, নিজেদের সহায়-সম্পদ লইয়াই বাঁচিতে হইবে, নিজেদের ঐতিহ্যের কাছে প্রেরণা পাইতে হইবে।

“আমাদের সামাজিক আদবকায়দা হইতে যাহাদের সামাজিক আদবকায়দা ভিন্ন, তাহাদের সহিত অন্তরঙ্গতা এড়াইয়া চলিতে হইবে। আমাদের হইতে যাহাদের আদর্শ পৃথক, তাহাদের জীবনের সহিত আমাদের মিলন ও মিশ্রণ উচিত হইবে না। প্রত্যেকটি মানুষ এক একটি ঝরনার মতো। প্রত্যেকটি জাতি যেন নদী। তাহাদের প্রত্যেকটিকে স্ব স্ব অনাবিল স্বচ্ছ ধারা বাহিয়া আগাইয়া চলিতে হইবে, যতক্ষণ না তাহারা মোক্ষের সমুদ্রে গিয়া উত্তীর্ণ হয়, যেখানে তাহাদের মিলন ও মিশ্রণ ঘটিবে।

ইহা জাতীয়তার জয়যাত্রা ছাড়া আর কি? অবিমিশ্র, সঙ্কীর্ণতম জাতীয়তা? দরজা-জানালা বন্ধ করিয়া ঘরে থাকো, কিছুই পরিবর্তন করিও না, যাহা আছে তাহার সবকিছুকেই আঁকড়াইয়া থাকো, কিছু রফ্‌তানি করিও না, কিছুই কিনিও না, দেহের ও আত্মার উন্নতি করো, করো শুদ্ধি। বাস্তবিকপক্ষে ইহা মধ্যযুগীয় ভিক্ষুদেরই মন্ত্র[৬২] আর উদারমনা গান্ধী কিনা এই পুস্তকের সহিত নিজের নাম জড়িত করিয়াছেন! রবীন্দ্রনাথ এই প্রতিক্রিয়াশীল জাতীয়তাবাদের স্রষ্টাদের সহিত পরিচিত হইয়া যে কেন বিভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাহা সহজেই বোঝা যায়। এই সকল প্রচারক, যাঁহারা শতাব্দীর যাত্রাপথ ফিরাইয়া দিতে চান, যাঁহারা মুক্ত আত্মাকে পিঞ্জরাবদ্ধ করিয়া আনন্দ পান, যাঁহারা প্রতীচ্যের সহিত যোগাযোগের সকল সেতুই ধ্বংস করিয়া ফেলিতে বদ্ধপরিকর, তাঁহাদের সহিত রবীন্দ্রনাথের যে মতানৈক্য ঘটিবে, তাহাতে বিস্ময়ের আর কি আছে?[৬৩] বস্তুত, গান্ধীর মতবাদে আসলে এ ধরনের কিছুই নাই। রবীন্দ্রনাথের নিকট তাঁহার উত্তর হইতে দেখা যায়, তিনি বলিতেন, "স্বদেশী হইল বিশ্বের নিকট প্রেরিত একটি বাণী।" জগৎ রহিয়াছে। সুতরাং গান্ধীজী ইহাকে স্বীকার করেন। তিনি বলেন,[৬৪] "অসহযোগের

---

[৬২] অবশ্য এই "স্বদেশীর বাণীর" ভাষায় নৈতিক শক্তি ও সৌন্দর্য রহিয়াছে প্রচুর। "প্রতিশোধ লইও না। যাহা ঘটিয়াছে, ঘটিয়াছে। অতীতকে ফিরান যায় না। তাহা অনন্ত-কালের অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছে। তাহার বিরুদ্ধে মানুষের কোনো হাত নাই। অতীত অন্যায় ও অপরাধের জন্যে শাস্তি দিয়া প্রতিশোধ লইতে চেষ্টা করিও না। অতীতই অতীতকে কবর দিক। অন্তরে বিবেক এবং আকাশে বিধাতাকে রাখিয়া জীবন্ত বর্তমানে কাজ করিয়া যাও।"

এই পুস্তকের আগাগোড়াই তুষার-প্রপাতের হিম-নির্মল স্রোত বহিতেছে।

[৬৩] বিশেষ করিয়া এই ধরনের লেখাগুলিই রবীন্দ্রনাথকে মর্মাহত করিয়াছিল। কারণ, ইহা হইতে গান্ধীজীর আশ্রম (যেখানে 'স্বদেশীর বাণী' রচিত হয়) এবং রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনের মধ্যে একপ্রকার রেষারেষি দেখা গেল। এই রেষারেষিকে গান্ধীজী ও রবীন্দ্রনাথ উভয়েই মোলায়েম করিয়া লইতে চাহিলেন। ১৯২২-এর ৯ই ফেব্রুয়ারিতে প্রকাশিত 'ইয়ং ইন্ডিয়া'র এক প্রবন্ধে গান্ধীজী অনুযোগ করেন যে, এক সাংবাদিক তাঁহার আশ্রম-সংক্রান্ত কথাগুলিকে ভুল করিয়া উল্লেখ করিয়াছে, যাহার ফলে তিনি রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনের সমালোচনা করিয়াছেন, এইরূপ অর্থ দাঁড়াইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষালয় সম্পর্কে গান্ধীজী তাঁহার শ্রদ্ধা জানাইলেন এবং সেই সঙ্গে রসিকতা করিয়া বলিলেন যে, এই দুইটি শিক্ষালয়ের মধ্যে কোন্‌টি শ্রেষ্ঠ তাহা যদি স্থির করিতে হয়, তবে তিনি আশ্রমের শৃঙ্খলা সত্ত্বেও শান্তিনিকেতনের পক্ষেই ভোট দিবেন। শান্তিনিকেতন বয়সে অগ্রজ এবং জ্ঞানে প্রবীণ। তবে, গান্ধীজী বলেন, "এই ছোট্টো আশ্রমটি যে বাড়িয়া উঠিতেছে, সে বিষয়ে শান্তিনিকেতনের ছাত্ররা যেন সচেতন ও সতর্ক থাকেন।"

[৬৪] আমার মতে গান্ধীজী রবীন্দ্রনাথের মতোই বিশ্বপ্রেমিক। তবে উভয়ের রীতি ভিন্ন। ধর্মভাবের মধ্য দিয়া গান্ধীজী বিশ্বপ্রেমিক, এবং বুদ্ধি-চেতনার মধ্য দিয়া রবীন্দ্র-নাথ। খ্রীষ্টান ধর্মের প্রথম প্রচারকেরা যেমন ইহুদি ও অইহুদির মধ্যে কোনো পার্থক্য করেন নাই, উভয়ের উপরই সমান নৈতিক ও শৃঙ্খলা আরোপ করিতে চাহিতেছিলেন, গান্ধীজীও তেমনি উপাসনা ও দৈনন্দিন কর্তব্য হইতে কাহাকেও বাদ দেন নাই।...... গান্ধীজী মধ্যযুগীয় বিশ্বপ্রেমিক। আমরা তাঁহাকে শ্রদ্ধা করি। কিন্তু বুঝি এ সমর্থন কবি রবীন্দ্রনাথকে।

লক্ষ্য ইংরেজ বা প্রতীচ্য নয়। বস্তু-সভ্যতা এবং বস্তু-সভ্যতার অনুগামী লালসা ও দুর্বলের শোষণের সহিতই আমাদের অসহযোগ।" অর্থাৎ, ইহা পশ্চিমের ত্রুটির সংশোধন করিতে চায়; সুতরাং ইহা পশ্চিমের পক্ষেও উপকারী হইবে। "আমাদের অসহযোগ হইল আমাদের আপনার মধ্যে ফিরিয়া আসা।" এই ফিরিয়া আসা সাময়িক। ইহার উদ্দেশ্য সমগ্র মানবতার সেবায় আত্মনিয়োগের পূর্বে ভারতের সকল শক্তিকে সংহত করা, গ্রথিত করা। "সমগ্র মানবতার জন্য জীবন-দানের উচ্চাকাঙ্ক্ষা করিবার পূর্বে ভারতকে বাঁচিতে শিখিতে হইবে।" গান্ধীজী সমস্ত মানুষের জন্য নির্ভুল আদর্শ নির্দিষ্ট করিয়াছেন, তাহা যদি ইউরোপ পালন করে, তবে, ইউরোপের সহিত সহযোগিতা করিতে গান্ধীজী নিষেধ করেন নাই।

গান্ধীজীর সমর্থিত এই "বাণীর" মধ্যে যাহা প্রকাশিত হইয়াছে, গান্ধীজীর সত্যিকারের মতবাদ তাহার অপেক্ষা অনেক পরিমাণে উদার, মানবিকতাপূর্ণ এবং বিশ্ব-প্রসারী।[৬৫] গান্ধীজী এই 'বাণী'-র সহিত আপনার নাম জড়িত করিলেন কেন? কেন তিনি তাঁহার আদর্শকে, সমগ্র বিশ্বের নিকট প্রেরিত তাঁহার বাণীকে, ভারতীয় ধর্ম-শাসনের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে কারারুদ্ধ করিলেন? কেন? শিষ্যদের সম্পর্কে সাবধান! তাঁহারা যতোই শুদ্ধ হইবেন, ততই তাঁহারা হইবেন বিপজ্জনক। ভগবান মহাপুরুষদিগকে তাঁহাদের পারিষদের হাত হইতে রক্ষা করুন—যে পারিষদরা মহাপুরুষের আংশিক মাত্র বহনের ক্ষমতা রাখেন, আদর্শকে লিপিবদ্ধ করিতে গিয়া তাঁহার সঙ্গতি নষ্ট করিয়া ফেলেন। কারণ, আদর্শের সঙ্গতিই মহাপুরুষের জীবন্ত আত্মার আশীর্বাদ।

কিন্তু ইহাই ত সবটুকু নহে। যে সকল শিষ্য মহাপুরুষের সান্নিধ্যে থাকেন, তাঁহারা অন্ততঃপক্ষে তাঁহার দিব্য মনোভাবের সামান্য বর্ণাভাও লাভ করিতে সমর্থ হন। কিন্তু এই শিষ্যদের শিষ্যরা কিংবা অন্যরা, জনসাধারণ, যাঁহাদের কাছে এই মতবাদ অস্পষ্ট, বিচ্ছিন্ন প্রতিধ্বনির মতো আসিয়া পেঁাছিয়াছে; তাঁহাদের কি হইবে? তাঁহারা এই মানসিক শুদ্ধি ও সৃজনশীল ত্যাগের বাণী হইতে কি এবং কতোখানি গ্রহণ করিয়াছেন? দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহাদের নিকট এই মতবাদ অতীব আদিম ও বস্তুগত রূপের মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। মেশাইয়ার আগমনের প্রত্যাশায় মানুষ একদা যেমন প্রতীক্ষা করিয়াছিল, তেমনি চরকার পথে কবে স্বরাজ আসিবে, তাহার প্রতীক্ষার রূপ লইয়াই যেন এই মতবাদ তাহাদের কাছে আসিয়া পেঁাছিয়াছে! ইহা সকল প্রকার অগ্রগতিরই অস্বীকার। ইহা সেই পুরাতন Fouri Barbari. হিংসার প্রচারকদের বলপ্রয়োগে রবীন্দ্রনাথ ভীত হইয়া উঠিলেন, এবং তাহা অকারণেও নহে। গান্ধীজীও এই আশঙ্কা হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত রহিলেন না। তিনি বলিলেন, তিনি যদি ইংরেজদের প্রতি ঘৃণা অনুভব করেন, তবে তিনি অচিরেই "এই অভিযান হইতে সরিয়া আসিবেন।" কারণ, কেবলমাত্র শত্রুর কাজকে ঘৃণা করিতে হইবে এবং শত্রুকে ভালোবাসিতে হইবে। শয়তানকে ভালোবাসিয়া শয়তানিকে ঘৃণা করিতে হইবে। অবশ্য এই পার্থক্যটি একটু অতি-বেশী সূক্ষ্ম, যাহার ফলে ইহাকে আয়ত্ত করা সাধারণ মানুষের পক্ষে কঠিন হইয়া পড়ে। প্রতিবারে যখন

কংগ্রেসের অধিবেশন হয়, এবং নেতারা ইংরেজদের অপরাধ ও বিশ্বাসঘাতকতা সম্পর্কে অগ্নিস্রাবী বক্তৃতা দেন, তখন ক্রোধ ও আক্রোশ রুদ্ধ দ্বারের পাশে পুঞ্জীভূত হইতে থাকে। সাবধান, যদি এই দরজা ভাঙিয়া পড়ে। ১৯২০-র আগস্ট মাসে বোম্বাইয়ে যখন গান্ধীজী বহুমূল্য দ্রব্যাদি পোড়াইবার পক্ষ সমর্থন করিয়া রবীন্দ্রনাথের বন্ধু এণ্ড্রুজকে বলেন, "তিনি বিদ্বেষকে মানুষ হইতে বস্তুতে অন্তরিত করিতেছেন," তখন তিনি বুঝিতে পারেন নাই যে জনসাধারণের উন্মত্ত আক্রোশ ক্রমেই শক্তি সংগ্রহ করিতেছে, এবং স্বভাবত জনসাধারণ ভাবিতেছে, "প্রথমে মাল, তাহার পরেই মানুষ!" তখনও তিনি কল্পনা করেন নাই যে, এই বোম্বাইয়েই অনধিক তিন মাস বাদে মানুষ মানুষকে হত্যা করিবে। গান্ধীজী অতি-বেশি ঋষি-তুল্য। তিনি এমন নির্মল, এমন মুক্ত যে, মানুষের মধ্যে যে পশুর কামনা ঘুমাইয়া থাকে, তাহা তাঁহার মধ্যে বিন্দুমাত্রও ছিল না। তিনি কল্পনাও করিতে পারেন নাই যে, জনসাধারণের মধ্যে এই পশুগুলি তাঁহারই বাণীর রসে দিন দিন পুষ্ট হইয়া উঠিতেছে। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টির স্বচ্ছতা ছিল আরো বেশী। অসহযোগীরা যখন নির্দোষের মতো ইউরোপের অপরাধ অনাবৃত করিয়া দেখাইতেছিল, মুখে অহিংসার কথা বলিতেছিল এবং সেই সঙ্গে জনসাধারণের মনে হিংসার আসন্ন মহামারীর বীজ উপ্ত করিতেছিল, তখন তাহারা যে কী বিপদ গোপন করিয়া রাখিতেছিল, রবীন্দ্রনাথ তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু এই অহিংসার ঋষি যাঁহার মনে ঘৃণার বিন্দুমাত্র ছিল না, তিনি এই ব্যাপারটিকে উপলব্ধি করিতে পারিলেন না। অথচ, যাঁহারা মানুষকে কর্মের পথে পরিচালিত করেন, তাঁহাদের কেবল নিজেদের হৃৎস্পন্দন বুঝিলেই চলে না, অপর সবারও বুঝিতে হয়। উচ্ছৃঙখল জনতা হইতে সাবধান! গান্ধীজীর কোনো নৈতিক উপদেশই ইহাকে শৃঙখলিত করিতে পারিবে না। উন্মত্ত বিক্ষোভ হইতে ইহাকে নিরস্ত করিবার, বা কোনো প্রভুর কঠোর শাসন-শৃঙখলার কাছে ইহাকে সবিনয়ে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য করিবার সম্ভবত একমাত্র উপায় হইল এই প্রভুটির ভগবানের অবতার সাজিয়া থাকা। কিন্তু তাঁহার স্বকীয় দীনতা এবং সারল্যের জন্য গান্ধীজী সেই ভূমিকা গ্রহণ করিতে পারিবেন না।

ফলে এখন, এই মানব-সমুদ্রের ঊর্ধ্বে কেবল একটিমাত্র মানুষের কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হইতে থাকিবে, একটিমাত্র মানুষের। কিন্তু আর কতোক্ষণই বা তাহা ধ্বনিত হইবে? যাহাই হোক আমাদিগকে তাহারই প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতে হইবে। সমারোহময়, বেদনাময় এই প্রতীক্ষা!

তৃতীয় অধ্যায়

১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলন দ্রুত অগ্রসর হইতে লাগিল। সারা বৎসরটাই অনিশ্চয়তা ও প্রত্যাশার মধ্য দিয়া কাটিল। দাঙ্গা-হাঙ্গামাও দেখা দিলো, ফলে গান্ধীজীর উপর এই ঘটনা-স্রোতের উঠা-নামা অনিবার্যভাবে প্রতিফলিত হইল।

দীর্ঘকাল ধরিয়া শত্রুতা বৃদ্ধি পাইতেছিল। সরকারের পাশবিক দমননীতির ফলেই তাহা পরিণত হইল প্রকাশ্য বিদ্রোহে। নাসিক জিলার মালিগাঁও-এ এবং বিহারের গিরিডিতে দাঙ্গা-হাঙ্গামা বাধিল। ১৯২১ সালের মে মাসের গোড়ার দিকে আসামেও কয়েকটি গুরুতর সংঘর্ষ ঘটিল। চা-বাগানেও বারো হাজার কুলি কাজ বন্ধ করিল এবং সরকারের নিযুক্ত গুর্খা কর্তৃক তাহারা আক্রান্ত হইল। পূর্ববঙ্গে রেল ও স্টীমারের শ্রমিকরাও প্রতিবাদে দুই মাসের ধর্মঘটের ব্যবস্থা করিল। এই চাঞ্চল্যকে শান্ত করিবার জন্য গান্ধীজী স্বয়ং সাধ্যমতো চেষ্টা করিতে লাগিলেন। মে মাসে তিনি বড়লাট লর্ড রিডিং-এর সহিত দীর্ঘ আলাপ-আলোচনা করিলেন। আলি ভাইরা তাঁহাদের উত্তেজক বক্তৃতার দ্বারা নাকি হিংসাত্মক কার্যে জনসাধারণকে প্ররোচিত করিতেছিলেন। গান্ধীজী তাঁহাদের সহিতও আলাপ করিলেন এবং তিনি তাঁহার এই মুসলমান বন্ধুদ্বয়কে "প্রত্যক্ষে বা প্রকারান্তরে হিংসার সমর্থন হইতে নিরস্ত করিলেন।"

যাহাই হউক, যতোই সময় যাইতে লাগিল, অসহযোগ আন্দোলনও ততোই শক্তিশালী হইয়া উঠিল, বিশেষ করিয়া মুসলমান অংশ দুর্দম হইয়া উঠিলেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ৮ই জুলাই করাচীতে নিখিল ভারত খিলাফত সম্মেলনে তাঁহারা মুসলমানদের দাবিগুলির পুনরাবৃত্তি করিবার পর ঘোষণা করিলেন যে, ইংরেজ সৈন্যবাহিনীতে কোনো মুসলমান চাকরি করিবেন না বা সৈন্য-সংগ্রহে তাঁহারা কোনো প্রকার সাহায্য করিবেন না। বস্তুত এই সম্মিলন ভারতে এক 'রিপাব্লিক' ঘোষণা করার ভয়ও দেখাইলেন এবং সরকার যদি আঙ্গোরা নেতাদের প্রতি তাঁহাদের বৈরী মনোভাব পরিবর্তন না করেন, তবে ডিসেম্বর মাসে জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে তাঁহারা আইন অমান্যের জন্য জনমত সৃষ্টি করিবেন। ইহার স্বল্পকাল পরেই, ২৮শে জুলাই কংগ্রেস কমিটি (নূতন গঠনতন্ত্র অনুসারে নির্বাচিত প্রথম কংগ্রেস কমিটি) বোম্বাই অধিবেশনে প্রিন্স অফ ওয়েল্‌স্‌কে বয়কট করিতে সিদ্ধান্ত করিলেন। প্রিন্স অব ওয়েল্‌সের ভারত আগমনের কথা সেইমাত্র ঘোষণা করা হইয়াছিল। এই কমিটি আরো জানাইলেন যে ২০শে সেপ্টেম্বরের পূর্বেই সকল প্রকার বিদেশী দ্রব্য-বর্জন কার্যে পরিণত হইবে। জাতীয় কংগ্রেস কমিটি সুতাকাটা এবং বয়নকেও নিয়মিত এবং তীব্রতর করিবার জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিলেন এবং মদ্য-ব্যবসায়ীদিগকে সরকার সাহায্য করা সত্ত্বেও পানদোষের বিরুদ্ধে প্রবল অভিযান চালাইবার জন্য প্রতিষ্ঠানকে তাগিদ দিলেন। যাহাই হউক, খিলাফত সম্মিলনের মুসলমানগণের মতো কংগ্রেস কমিটি অতো উদ্ধত না থাকায়, তাঁহারা

বিপ্লবী মনোবৃত্তির নিন্দা করিলেন, আইন অমান্যের অসমর্থন জানাইলেন এবং অহিংসার প্রবলতর প্রচারকার্য চালাইবার সমর্থন করিলেন।

আগস্ট মাসে মোপলাদের একটি হিংসাত্মক বিদ্রোহ ঘটিল এবং ইহা কয়েক মাস ধরিয়া চলিল। মওলানা মহম্মদ আলির সহিত গান্ধীজী এই বিদ্রোহ শান্ত করিবার জন্য কলিকাতা হইতে মালাবার রওনা হইতে স্থির করিলেন। কিন্তু সরকার মওলানা মহম্মদ আলি, তাঁহার ভাই মওলানা সওকত আলি এবং অন্যান্য কয়েকজন বিখ্যাত মুসলমানকে খিলাফত সম্মিলনে আইন অমান্যের পক্ষে ভোট দেওয়ার অভিযোগে গ্রেফতার করিলেন। আলি-ভাইদের গ্রেফতারের সংবাদ পাইয়া কেন্দ্রীয় খিলাফত কমিটি দিল্লী অধিবেশনে খিলাফত সম্মিলনের প্রস্তাবকে সর্বসম্মতিক্রমে সমর্থন করিলেন। সমগ্র ভারতের নানা স্থানে শত শত বিক্ষোভ-শোভাযাত্রায় জনসাধারণ এই প্রস্তাবের সমর্থন জানাইল। ৪ঠা অক্টোবর তারিখে গান্ধীজীও ঘোষণা করিলেন যে, তাঁহার আদর্শও মুসলমানদের আদর্শের সহিত একত্রে গ্রথিত। নিখিল ভারত কংগ্রেসের পঞ্চাশ জন সদস্য কর্তৃক অনুমোদিত এক ইস্তাহারে গান্ধীজী ঘোষণা করিলেন যে, অসহযোগ সম্পর্কে মতামত প্রকাশ করিবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকেরই রহিয়াছে এবং যে সরকার ভারতের নৈতিক ও রাজনৈতিক অধঃপতন ঘটাইয়াছে, তাহার অধীনে কোন ভারতীয়ের পক্ষে, তিনি সামরিক বা অসামরিক কর্মচারী যাহাই হউক না কেন, চাকরি করা উচিত হইবে না। গান্ধীজী আরো বলিলেন, এই প্রকার সরকারের সহিত অসহযোগিতা অবশ্য কর্তব্য। করাচীতে আলি-ভাইদের বিচার হইল। অন্যান্য সহ-অভিযুক্তদের সহিত তাঁহারা দুই বৎসরের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন।

চতুর্গুণ শক্তির সহিত ভারতবর্ষ এই দণ্ডাদেশের জবাব দিল। ৪ঠা নভেম্বর তারিখে দিল্লীতে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি গান্ধীজীর ফতোয়া অনুমোদন করিলেন। এই কমিটি প্রত্যেক প্রদেশকে আপন আপন দায়িত্বে ট্যাক্স বন্ধ হইতে আরম্ভ করিয়া আইন অমান্য ঘোষণা করার অধিকার দিলেন। অবশ্য এই "প্রতিরোধীদের" সর্বপ্রথমে সুতা কাটা এবং অহিংসার ব্রত সহ স্বদেশীর অন্যান্য কর্মসূচীর প্রতি বিশ্বস্ততার শপথ গ্রহণ করিতে হইল। কমিটি গান্ধীজীর তত্ত্বাবধানে সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের সহিত শৃঙ্খলা এবং স্বার্থত্যাগের মিলন ঘটাইতে চাহিলেন। এই আন্দোলনের নিঃস্বার্থ দিকটাকে সুস্পষ্ট করিবার জন্য জানাইয়া দেওয়া হইল যে, প্রতিরোধীরা বা তাঁহাদের পরিবারের অন্যান্য ব্যক্তিরা কেহই কমিটির নিকট হইতে কোনো প্রকার আর্থিক সাহায্য পাইবেন না।

বিরাট আইন অমান্য আন্দোলন প্রায় কার্যকরী হয় হয়, এমন সময় ১৭ই নভেম্বর তারিখে প্রিন্স অব ওয়েল্‌স্‌ বোম্বাইয়ে অবতরণ করিলেন। প্রিন্সকে বয়কট করিবার আদেশ নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীরা পালন করিলেন, কিন্তু ধনী পার্শী এবং সরকারী কর্মচারীরা এই আদেশকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করিলেন। তাঁহাদের এই মনোবৃত্তি জনসাধারণের মধ্যে এমন বিক্ষোভ ও উন্মত্ত আক্রোশের সঞ্চার করিল যে, জনতা ধনীদের বাসভবন আক্রমণ করিল, গৃহ এবং সম্পত্তি লুণ্ঠিত হইল,

অত্যাচারের হাত হইতে কেহই বাদ পড়িলেন না, এমন কি স্ত্রীলোকরাও না। বহু লোক হতাহত হইলেন। যাহাই হউক, হিংসাত্মক ঘটনা এই একটিমাত্র ঘটিল। ভারতের অন্যান্য স্থানে সর্বত্রই উপাসনার শান্তি ও শৃঙ্খলার মধ্য দিয়াই হরতাল প্রতিপালিত হইল। কোনো প্রকার গোলযোগ হইল না। কিন্তু বোম্বাইয়ের দাঙ্গার সংবাদ গান্ধীজীর "হৃদয়ে তীরের মতো গিয়া বিঁধিল।" তিনি সংবাদ পাইয়াই ঘটনাস্থলে ছুটিলেন এবং দাঙ্গাকারীরা যখন তাঁহাকে অভিনন্দন জানাইল, তখন তাঁহার দুঃখের আর অবধি থাকিল না, তিনি সক্রোধে জনতাকে শৃঙ্খলাবন্ধ হইতে এবং স্থান ত্যাগ করিতে আদেশ দিলেন। তিনি ঘোষণা করিলেন যে, পার্শীরা যদি প্রিন্স অব ওয়েল্‌সের আগমন লইয়া উৎসব-সমারোহ করিতে চান, তবে তাহা করিবার তাঁহাদের সম্পূর্ণ অধিকার আছে। তাহা ছাড়া, যে কোন কারণেই হোক না কেন, বলপ্রয়োগের কোনো প্রকার ন্যায়সঙ্গতিই নাই। জনতা নীরবে গান্ধীজীর কথা শুনিল। কিন্তু কিছুদূরেই আবার দাঙ্গা বাধিয়া গেল। মনে হইল, জঘন্য শ্রেণীর মানুষগুলো যেন অকস্মাৎ মাটি ফুঁড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। ঘৃণায় ও আক্রোশে উৎক্ষিপ্ত বিশ হাজার মানুষের জনতার বুদ্ধি-চেতনা চকিতে ফিরাইয়া আনা সম্ভব ছিল না। তথাপি কয়েকটি জিলায় দাঙ্গাহাঙ্গামা সীমাবন্ধ হইয়া রহিল। এবং ইহার ফলে যে ক্ষতি হইল, তাহা ইউরোপের তুচ্ছতম বিপ্লবী হাঙ্গামায় যাহা ঘটে, তাহার অধিকও হইবে না। যাহাই হউক, গান্ধীজী বোম্বাইয়ের নাগরিক এবং অসহযোগী আন্দোলনকারীদের নিকট বেদনাময় এক আবেদন প্রচার করিলেন এবং জানাইলেন যে, এই সকল ঘটনা হইতেই বুঝা যায়, জনতা এখনো আইন অমান্যের জন্য প্রস্তুত হয় নাই। সুতরাং তিনি আইন অমান্য ঘোষণার আদেশটিকে সাময়িক ভাবে প্রত্যাহার করিলেন। তাঁহার অনুচরদিগের এই হিংসাত্মক কার্যের জন্য নিজেকে দণ্ডিত করার ইচ্ছায় তিনি প্রতি সপ্তাহে চব্বিশ ঘণ্টা করিয়া অনশন ব্রত অবলম্বন করিলেন।

ভারতে ইউরোপীয় বাসিন্দারা বোম্বাইয়ের দাঙ্গা-হাঙ্গামায় যতো না আতঙ্কিত হইলেন, তাহার অপেক্ষা বেশি হইলেন দেশব্যাপী সর্বসম্মত শান্ত ধর্মঘটের ফলে। তাঁহারা বড়লাট ও গভর্নমেণ্টকে ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে তাগিদ দিলেন, ফলে বিভিন্ন প্রদেশে ধারাবাহিকভাবে দমন-নীতি চলিতে লাগিল। ১৯০৮ সালে নৈরাজ্য-বাদী ও গোপন ষড়যন্ত্রকারীদের বিরুদ্ধে প্রয়োগের জন্য একটি আইন পাস হইয়াছিল। সেই পুরাতন আইনটিকে কবর হইতে খুঁড়িয়া বাহির করা হইল, এবং সেটিকে কংগ্রেস এবং খিলাফতের স্বেচ্ছাসেবক সংঘগুলির বিরুদ্ধে প্রয়োগ চলিতে লাগিল। হাজারে হাজারে লোক গ্রেফতার হইলেন। ফলে হাজারে হাজারে নূতন স্বেচ্ছাসেবক আসিয়া নাম লিখাইলেন। প্রাদেশিক কমিটিগুলি তাঁহাদিগকে তালিম দিলেন। ইতিমধ্যে ২৪শে ডিসেম্বর প্রিন্স অব ওয়েল্‌সের কলিকাতা আগমনের দিন একটি হরতাল নির্দিষ্ট হইল। ঐ দিন প্রিন্স কলিকাতায় নিস্তব্ধ জনমানবশূন্য পথগুলি অতিক্রম করিলেন।

আমেদাবাদে যখন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন আরম্ভ হইল, তখন

সর্বত্রই বিপ্লব ধোঁয়াইয়া উঠিতেছে মনে হইল। যে কোনো মুহূর্তে তাহা অগ্নি-কাণ্ডে পরিণত হইতে পারে। ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দের ফরাসী-বিপ্লবের প্রাক্কালীন স্টেট্‌স-জেনারেলের মতোই একটি থমথমে স্তব্ধ গম্ভীরভাব সর্বত্রই বিরাজ করিতেছিল। সেই সবেমাত্র কংগ্রেস-প্রেসিডেন্ট কারারুদ্ধ হইয়াছেন। আলাপ-আলোচনা স্বল্প-সংক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। কংগ্রেস পুনরায় অসহযোগে আস্থা ঘোষণা করিয়াছেন এবং সমস্ত দেশবাসীকে স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে নাম লিখাইতে এবং গ্রেফতারের সম্মুখীন হইবার জন্যে প্রস্তুত হইতে বলিতেছেন। জনসাধারণকে সর্বত্র জনসভার ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ করা হইয়াছে। কংগ্রেস এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, আইন অমান্য আন্দোলন যে-কোনো সশস্ত্র বিদ্রোহের সমান কার্যকরী এবং অপেক্ষাকৃত অধিক করুণাপূর্ণ। সেই সঙ্গে কংগ্রেস এই প্রস্তাবও গ্রহণ করিলেন যে, জনসাধারণ অহিংসার সত্যিকারের স্বরূপটি উপলব্ধি করিতে পারিলেই আইন অমান্যের আশ্রয় গ্রহণ করা হইবে। অধিবেশন শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই বহু কংগ্রেস প্রতিনিধি যে গ্রেফতার হইবেন, তাহা বুঝিয়া কংগ্রেস সদস্যগণ গান্ধীজীর উপর সকল ক্ষমতা ন্যস্ত করিয়া তাঁহাকে বস্তুত একাধিনায়কত্বের এবং তাঁহার উত্তরাধিকারী নির্বাচনের পূর্ণ অধিকার দিলেন। ইহার ফলে গান্ধীজী সমগ্র ভারতীয় রাজনীতির নিয়ন্তা হইয়া উঠিলেন। কংগ্রেস একটি বিষয়েই মাত্র তাঁহার অধিকার নিয়ন্ত্রিত রাখিল। সেটি হইল গান্ধীজী কংগ্রেস কমিটির মত না লইয়া জাতীয় আদর্শের কোনো পরিবর্তন বা সরকারের সহিত কোনো প্রকার মীমাংসা করিতে পারিবেন না। অধিবেশনের একাংশ ভারতের স্বাধীনতার জন্য প্রয়োজন হইলে হিংসার আশ্রয় সমর্থন করিয়া একটি প্রস্তাব পাস করাইতেও চেষ্টা করিলেন। কিন্তু অধিকাংশ, যাঁহারা গান্ধীজীর নীতিতে বিশ্বাস করিতেন, তাঁহাদের বিরোধিতায় এই প্রস্তাব বাতিল হইয়া গেল।

পরবর্তী কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া এক ধর্মভাবাপন্ন উৎসাহের স্রোত সমগ্র ভারতের উপর দিয়া বহিয়া গেল। বিশ হাজার নরনারী সানন্দে কারাবরণ করিলেন। তাঁহাদের পশ্চাতে ভারতের মুক্তির জন্য আত্মদান করিতে প্রস্তুত হইয়া অপেক্ষা করিয়া রহিল হাজার হাজার নরনারী।

পুনরায় গান্ধীজীর বিশ্বাস হইল যে ব্যাপকভাবে আইন অমান্যের জন্য দেশ প্রস্তুত হইয়াছে। স্থির হইল, সঙ্কেতস্বরূপ বোম্বাই প্রদেশের আদর্শ জিলা বারদৌলিতেই[৬৬] আন্দোলন প্রথম সুরু হইবে। এখানের লোকেরা গান্ধীজীর চিন্তা-ধারাকে চিরদিনই বুঝিয়াছে এবং অনুসরণ করিয়াছে। ১৯২২-এর ৯ই ফেব্রুয়ারী তারিখে বড়লাটের নিকট এক খোলা চিঠিতে গান্ধীজী তাঁহার কর্মসূচীর সুনির্দিষ্ট উল্লেখ করিলেন। পত্রখানি বিনয়াবনত হইলেও যুদ্ধেরই সুস্পষ্ট ঘোষণা। গান্ধীজী বলিলেন যে, তিনিই অসহযোগ আন্দোলনের নেতা, এবং ইহার সকল দায়িত্বই

---

৬৬ ১৪০ খানি গ্রাম এবং ৮৭,০০০ অধিবাসী লইয়া এই জিলা।

তাঁহার। যে-গভর্নমেণ্ট সংবাদপত্র, সভা-সমিতি এবং মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে নৃশংসভাবে সংকুচিত করিয়াছে, তাহার বিরুদ্ধে বারদোলিতে অহিংসাত্মক গণ-বিদ্রোহের প্রথম বাহিনীর অভ্যুত্থান ঘটিবে। গান্ধীজী লর্ড রীডিংকে তাঁহার সরকারী নীতির পরিবর্তনের জন্য এক সপ্তাহ সময় দিলেন। যদি "বড়লাট এমন অতি স্পষ্ট ব্যাপারটিকে দেখিতে না পান বা দেখিতে না চান," তবে আইন অমান্য ঘোষিত হইবে।[৬৭] বড়লাটের নিকট চিঠিখানি পাঠানো হইতে না হইতেই দাঙ্গা-হাঙ্গামা দেখা দিল। ইহা অন্যান্য সকল দাঙ্গা-হাঙ্গামার অপেক্ষা গুরুতর আকারের। গোরখপুর জিলার চৌরিচৌরা নামক স্থানে এক শোভাযাত্রার সময়ে, শোভাযাত্রা চলিয়া যাইবার পর বলাই ভালো, পিছনের কয়েকজন লোককে কনস্টবলেরা "বাধা দেয় এবং আক্রমণ করে।" অতঃপর কনস্টবলেরা জনতা কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া গুলী চালায় এবং গুলী-বারুদ ফুরাইয়া গেলে, তাহারা থানায় গিয়া নিরাপত্তার জন্য আশ্রয় লয়। উচ্ছৃংখল জনতা থানায় অগ্নিসংযোগ করে এবং অবরুদ্ধদের কাকুতিতে কর্ণপাত করে না। ফলে নৃশংস হত্যা এবং অগ্নিকান্ড ঘটে। কনস্টবলেরাই প্রথম উসকানি দিয়াছিল এবং আক্রমণের ব্যাপারে অসহযোগী স্বেচ্ছাসেবকদের কাহারো কোন হাত ছিল না। সুতরাং গান্ধীজী এই দুর্ঘটনার সকল দায়িত্ব ন্যায়সঙ্গত ভাবেই অস্বীকার করিতে পারিতেন। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তিনি সমগ্র ভারতের বিবেক হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহার দেশের জনসাধারণের কাহারও কোনো প্রকার অপরাধ তাঁহাকে বেদনায় ব্যাকুল করিয়া তোলে। তাই তিনি জনসাধারণের সমস্ত পাপকে নিজের উপরই ন্যস্ত করিলেন। তিনি এরূপ আতঙ্কিত হইয়া উঠিলেন যে, আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করিবার মুহূর্তেই, তিনি তাহা দ্বিতীয়বারের জন্য পুনরায় বন্ধ করিয়া দিলেন। বোম্বাই হাঙ্গামার অপেক্ষা অবস্থা জটিলতর হইয়া উঠিল। এবং বড়লাটের নিকট চরম পত্র পাঠাইবার মাত্র কয়েক দিন পূর্বেই তাহা ঘটিল। তাঁহার কর্মসূচীকে বেআইনী এবং এমনকি হাস্যকর প্রতীয়মান না করিয়া তিনি এই চরম পত্র কেমন করিয়া পাঠাইতে পারেন? গান্ধীজী বলিলেন, "শয়তান বাধা দিল।" শয়তানের ভাষা হইল দম্ভ, গান্ধীজী এই কথা বলিয়া তাঁহার ইস্তাহার প্রত্যাহার করিলেন।

১৯২২ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারি তারিখে ইয়ং ইণ্ডিয়াতে গান্ধীজীর একটি প্রবন্ধ বাহির হইল। অসাধারণ মানবিকতাপূর্ণ এই রচনা। ইহা গান্ধীজীর আত্মা-পরাধের প্রকাশ্যে স্বীকারোক্তি। তাঁহার মর্মাহত অন্তরের গভীরতম প্রদেশ হইতে তাঁহার ওষ্ঠ ধন্যবাদের ভাষায় ধ্বনিত হইয়া উঠিল। ভগবান তাঁহাকে অবনত করিয়াছেন, তাই তাঁহার এই ধন্যবাদ :

"ভগবান আমার উপর সুপ্রচুররূপে সদয় হইয়াছেন। তিনি আমাকে এই তৃতীয়-

---

[৬৭] ঐ তারিখের ইয়ং ইণ্ডিয়াতে লিখিত একটি নোটে এই বিষয়টি আরো স্পষ্ট। যদি বড়লাট জবাব না দেন, তবে অধিকাংশের অনিচ্ছাসত্ত্বেও আইন অমান্য ঘোষণা করা হইবে।

বারের জন্য সতর্ক করিয়া দিয়াছেন যে, ভারতে এখনো সত্য এবং অহিংসার আবহাওয়া প্রস্তুত হয় নাই। কেবল মাত্র সত্য এবং অহিংসার আবহাওয়াই এই ব্যাপক অনানুগত্যকে ন্যায়সংগত করিয়া তুলিতে পারে। এই অনানুগত্য বা disobedience-কে তখনই civil বলা চলিতে পারে, যখনই তাহা হইবে শান্ত, সত্য, বিনত, জ্ঞাত এবং স্বেচ্ছাকৃত, অথচ প্রীতিপূর্ণ, ঘৃণাশূন্য, এবং নিরপরাধ। রাউলাট-আইন-বিরোধী আন্দোলনের সময় ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি আমাকে সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন। আমেদাবাদ, বিরামবাগ, ও খেড়া ভুল করিল। আমি পিছাইয়া আসিলাম। আমার হিসাবে ভয়ংকর রকম বেহিসাব হইয়াছে, স্বীকার করিলাম; ভগবান ও মানুষের কাছে মাথা হেঁট করিয়াছি। কেবল যে জনসাধারণের আইন অমান্য থামাইলাম, তাহাই নয়, এমন কি নিজের আইন অমান্যও বন্ধ করিলাম।...দ্বিতীয় বারে ভগবান আমাকে বোম্বাইয়ের ঘটনাবলী দ্বারা ভয়ানকভাবে সতর্ক করিয়া দিলেন। আমাকে তিনি এই দুর্ঘটনা প্রত্যক্ষ করাইলেন।... বারদৌলিতে অবিলম্বে যে ব্যাপক আইন অমান্য হইবার কথা ছিল, আমি তাহা বন্ধ করিবার ইচ্ছা ঘোষণা করিলাম। আমার মাথা ১৯১৯-এর অপেক্ষাও আরো বেশী হেঁট হইল। কিন্তু ইহাতে আমি উপকৃত হইলাম; এবং আইন অমান্য বন্ধ রাখিবার ফলে দেশেরও যে প্রচুর লাভ হইল, সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ। আন্দোলন সাময়িক বন্ধ রাখার ফলে ভারতবর্ষ সত্য এবং অহিংসার প্রতীক হইয়া উঠিল।

"কিন্তু ইহা অপেক্ষাও তিক্ততর দীনতা ভারতবর্ষের গর্ভে লুক্কায়িত ছিল।... চৌরি-চৌরার মধ্য দিয়া ভগবান স্পষ্টভাবে কথা কহিয়া উঠিলেন। ভারত যখন অহিংস উপায়ে স্বাধীনতার সিংহাসনে আরোহণ করিবার আশা করে, তখন প্রবলতম উশকানির উত্তরেও উচ্ছৃংখল জনতার সহিংস হইয়া উঠা কোনোমতেই শুভ লক্ষণ নহে।...অহিংস উপায়ে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার লাভের শর্তই হইল দেশের সহিংস অংশের উপর অহিংস জনসাধারণের কর্তৃত্ব থাকা। ভারতের গুন্ডাদের উপর যখন অহিংস অসহযোগীরা কর্তৃত্ব লাভ করিতে পারিবে, কেবল তখনই তাহাদের সফল হওয়া সম্ভব হইবে।"

সুতরাং ১১ই ফেব্রুয়ারী তারিখে বারদৌলিতে গান্ধীজী "তাঁহার সংশয় এবং আশংকাগুলি" কংগ্রেস কমিটির নিকট উত্থাপিত করিলেন। কিন্তু তাঁহারা তাঁহার সহিত সকলে একমত হইলেন না। গান্ধীজী বলেন, "তথাপি এমন বিচক্ষণ ও ক্ষমাশীল সহকর্মীদিগকে পাওয়ার সৌভাগ্য বোধ করি আর কেহ করে নাই।"

তাঁহারা গান্ধীজীর সূক্ষ্ম বিবেকবুদ্ধিকে সহানুভূতির সহিত দেখিলেন এবং গান্ধীজীর অনুরোধে আইন অমান্যের আদেশ সাময়িকভাবে প্রত্যাহার করিলেন। সেই সঙ্গে তাঁহারা প্রস্তাব করিলেন যে, সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলি যেন অহিংস আবহাওয়া সৃষ্টির জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে থাকে।

"এইরূপে সমগ্র আক্রমণশীল কর্মসূচীর দ্রুত ও আকস্মিক পরিবর্তন যে রাজনীতির দিক হইতে সম্ভবত বিচক্ষণ ও ত্রুটিহীন হইল না, তাহা আমি জানি। কিন্তু ধর্মের দিক হইতে ইহা যে ত্রুটিহীন, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। আমার

এই দীনতা এবং ত্রুটি স্বীকারের মধ্য দিয়া দেশের প্রচুর উপকার হইবে। যে একমাত্র গুণের আমি দাবি করি, তাহা হইল সত্য এবং অহিংসা। কোনো প্রকার অতিমানবিক শক্তির দাবি আমি করি না। সেরূপ কোনো শক্তি আমার নাই। দুর্বলতম মানুষের দেহে যে রক্তমাংস, আমার দেহেও তেমনি সহজদুষ্য রক্তমাংসই রহিয়াছে। সুতরাং অন্য সকলের মতোই ভুল করিবার সম্ভাবনা আমারও আছে। আমার সেবা করিবার শক্তি সীমাবন্ধ। তথাপি আমার শক্তির বহু দোষ-ত্রুটি সত্ত্বেও আমি এ পর্যন্ত সর্বদাই ভগবানের আশীর্বাদ লাভ করিয়া আসিয়াছি!

"কারণ, ত্রুটি-স্বীকার যেন এক প্রকার সম্মার্জনী, যাহার আঘাতে সকল মালিন্য দূর হয়, সকল অবয়ব শুদ্ধতর উজ্জ্বলতর হয়। আমি ইহার জন্য নিজেকে আরো শক্তিমান অনুভব করিতেছি। হটিয়া আসার ফলে আমাদের আদর্শ সফলই হইবে। মানুষ যদি সোজা পথ ছাড়িয়া কেবলই বাঁকা পথে যাইতে চায়, তবে সে কখনো তাহার লক্ষ্যে উপনীত হইতে পারে না। চৌরি-চৌরার ঘটনা বারদৌলিতে অর্শায় না, বলা হইয়াছে। সে বিষয়ে আমারও কোন সন্দেহ নাই। আমার মতে, বারদৌলির অধিবাসীরা ভারতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শান্তিপূর্ণ মানুষ। কিন্তু ভারতের মানচিত্রে বারদৌলি একটি নগণ্য বিন্দু মাত্র। যদি ভারতের অন্যান্য অংশ হইতে ত্রুটিহীন সহযোগিতা না পাওয়া যায়, তবে বারদৌলির চেষ্টা কখনই সফল হইতে পারে না। যেমন এক বাটি দুধে এক ফোঁটা আর্সেনিক দিলে তাহা পানের অযোগ্য হইয়া উঠে, তেমনি বারদৌলির শান্তিময়তায় যদি চৌরি-চৌরার এক বিন্দু মৃত্যু-হলাহল-ও মিশে, তবে তাহা গ্রহণের অযোগ্য হইয়া উঠিবে। বারদৌলি যেমন ভারতের প্রতিনিধিত্ব করে, তেমনি করে চৌরি-চৌরাও। যাহাই হউক, চৌরি-চৌরা একটি বাড়াবাড়ি লক্ষণ। সিভিল ডিস্‌ওবিডিয়েন্স বা শান্তিপূর্ণ অনানুগত্যে কোনো প্রকার উত্তেজনা থাকিবে না। আইন অমান্য হইল নীরব সহনের প্রস্তুতি। ইহার ফল শান্ত এবং সহজ মনে না হইলেও ইহা চমকপ্রদ।...চৌরি-চৌরার এই ট্র্যাজেডি বস্তুত একটি সংকেত মাত্র। যদি পূর্ব হইতে বিধান করা না হয়, তবে ভারত কোন্ পথে যাইবে, ইহা তাহাই নির্দেশ করে। আমরা যদি অহিংসা হইতে হিংসাকে গড়িয়া তুলিতে না চাই, তবে আমাদিগকে দ্রুত পিছনে সরিয়া আসিতে হইবে। পুনরায় প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে শান্তির আবহাওয়া। এবং ব্যাপক আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ হইবার পর গভর্নমেণ্টের শত উশকানি সত্ত্বেও শান্তি অব্যাহত থাকিবে, এ সম্বন্ধে আমরা যতক্ষণ না নিশ্চিত হইতে পারিতেছি, ততক্ষণ পর্যন্ত ব্যাপক আইন অমান্য আন্দোলনের কথা ভাবাও চলিবে না। শত্রুরা আমাদের এই দীনতা ও তথাকথিত পরাজয় স্বীকারে আনন্দ করুক, তাহাতে ক্ষতি কি? ভগবানের কাছে পাপ করিবার এবং শপথ ভাঙিবার অপরাধে অভিযুক্ত হইবার অপেক্ষা তাহা অনেক শ্রেয়।"...

অতঃপর অহিংসার ঋষি অপরে যে রক্তপাত করিয়াছে তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতে চাহিতেছেন :

"আমাকে ব্যক্তিগত ভাবে শুদ্ধিলাভ করিতে হইবে। নিজেকে যোগ্যতার যন্ত্র

করিয়া তুলিতে হইবে, যাহাতে আমার চারিপাশের নৈতিক আবহাওয়ায় বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম ঘটিলে আমি তাহা বুঝিতে পারি। আমার সত্যের মধ্যে যেন গভীরতর সত্য এবং দীনতা থাকে। শুদ্ধির জন্য আমার পক্ষে অনশনের অপেক্ষা আর কিছুই নাই। আপনার পূর্ণতর প্রকাশের জন্য, দেহের উপর অধিকার প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য যে অনশন করা হয়, তাহার অপেক্ষা আপনার উন্নতির ব্যাপারে প্রবলতর বস্তু আর নাই।”...[৬৮]

গান্ধীজী চারদিনব্যাপী এক অনশন ব্রত গ্রহণ করিলেন। তাঁহার সহকর্মিগণ তাঁহার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেন, তাহা তিনি চাহিলেন না। তাঁহার নিজেকেই শাস্তি গ্রহণ করিতে হইবে। “অনিপুণ অস্ত্রচিকিৎসককে যখন কোনো বিপজ্জনক রোগীর চিকিৎসা করিতে হয়, তখন তিনি যেমন শোচনীয় অবস্থায় পড়েন, আমিও তেমনি একটি শোচনীয় অবস্থায় পড়িয়াছি। হয় আমাকে চিকিৎসা ত্যাগ করিতে হইবে, নতুবা অধিকতর নৈপুণ্য অর্জন করিতে হইবে।” তাঁহার নিজের জন্য এবং তাঁহার নাম মুখে লইয়া চৌরি-চৌরায় যাহারা অপরাধ করিয়াছিল, তাহাদের জন্য তাঁহার এই শাস্তি, এই প্রায়শ্চিত্ত। গান্ধীজী একাই তাহাদের শাস্তি গ্রহণ করিতে পারিলে সুখী হইতেন। কিন্তু তিনি তাহাদিগকে স্বেচ্ছায় গভর্নমেণ্টের হস্তে আত্মসমর্পণ করিতে এবং সমস্ত অপরাধ স্বীকার করিতে উপদেশ দিলেন। কারণ, তাহারা যে আদর্শকে সেবা করিতে চাহিয়াছিল, তাহারা তাহাকেই আঘাত করিয়া বসিয়াছে।

“আন্দোলন যাহাতে সহিংস বা হিংসার অগ্রদূত হইয়া উঠিতে না পারে, সেজন্য আমি সকল প্রকার দীনতা, সকলপ্রকার উৎপীড়ন, পূর্ণ নির্বাসন এবং মৃত্যু-ও বরণ করিতে রাজী আছি।”

সমগ্র মানবতার আধ্যাত্মিক প্রগতির ইতিহাসে এমন মহানুভব ঘটনা কদাচিৎ দেখা যায়। এইরূপ কোন কার্যের নৈতিক মূল্যের তুলনা হয় না। রাজনীতিক চাল হিসাবে ইহা হতাশ করে। গান্ধীজী নিজেও ইহাকে “রাজনীতির দিক হইতে বিচক্ষণ এবং ত্রুটিহীন নহে” বলিয়াই স্বীকার করিয়াছেন। সমস্ত শক্তিকে একত্রিত করিয়া, তাহাকে একটি সূচীবদ্ধ কোনো আন্দোলনের জন্য অধীর ভাবে দীর্ঘকাল প্রতীক্ষিত রাখিয়া অবশেষে হাত তুলিয়া শেষ আদেশ প্রদান করিবার পর অকস্মাৎ, শেষ মুহূর্তে যখন সেই দুর্বার যন্ত্র গতিশীল হইয়া উঠিয়াছে, তখন তাহাকে হাত নামাইয়া তিনবার থামিতে বলা, ইহাও নিতান্তই বিপজ্জনক। ইহাতে ব্রেক ভাঙিবারও যেমন ভয় আছে, তেমনি ভয় আছে সমস্ত গতিবেগকে পঙ্গু করিয়া দেওয়ার।

তাই, ১৯২২-এর ২৪শে ফেব্রুয়ারি তারিখে দিল্লীতে যখন কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন বসিল, তখন গান্ধীজীকে প্রবল বিরোধিতার সম্মুখীন হইতে হইল। ওয়ার্কিং কমিটি বারদৌলি-সংক্রান্ত যে প্রস্তাবকে এগারো তারিখে সমর্থন

---

[৬৮] যে আত্মার উপর জনসাধারণের সকল ভাবাভিব্যক্তিই ছাপ রাখিয়া যায়, সেই আত্মার প্রহেলিকাময় শক্তির উপর এই কথাগুলি কী আলোকপাতই না করিতেছে!

করিয়াছিলেন, তাহা বিনা আলোচনায় অনুমোদন পাইল না। অসহযোগীরা দুই দলে বিভক্ত হইয়া পড়িলেন। গান্ধীজী দাবি করিলেন যে, আইন অমান্য অভিযান আরম্ভ করিবার পূর্বে জনসাধারণকে আরো ভালো ভাবে প্রস্তুত হইতে হইবে। সেই সঙ্গে তিনি একটি গঠনমূলক কর্মসূচীও উত্থাপন করিলেন। কিন্তু বহু সদস্য স্বাধীনতা আন্দোলনের অগ্রগতির মন্থরতায় বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন, তাঁহারা আইন অমান্য সাময়িকভাবে বন্ধ রাখার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিলেন। তাঁহারা বলিলেন যে, গান্ধীজীর রীতি দেশের আবেগ-উৎসাহকে গলা টিপিয়া মারিতেছে। ওয়ার্কিং কমিটির বিরুদ্ধে একটি অনাস্থা প্রস্তাব আনিবার কথাও হইল। এবং ইহাও বলা হইল যে, অন্যান্য প্রস্তাব এখন বাতিল করিয়া দেওয়া হউক। অবশ্য, অবশেষে গান্ধীজীরই জয় হইল। কিন্তু তিনি অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন, কারণ, তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, অধিকাংশ সদস্যেরই তিনি অকপট সমর্থন পাইতেছেন না। তিনি জানিতেন, একাধিক ব্যক্তি, যাঁহারা তাঁহাকে ভোট দিয়াছেন, তাঁহারা আড়ালে তাঁহাকে 'ডিক্টেটার' বলেন। তিনি জানিতেন যে, আসলে তিনি দেশের মনোভাবের প্রতিনিধিত্ব করিতেছেন না। গান্ধীজী তাঁহার নির্ভীক অকাপট্যের সহিত এই কথা ১৯২২ সালের ২রা মার্চ তারিখে স্বীকার করেন।

"সচেতন ও অচেতন হিংসার ফল্গুস্রোত এতই প্রবল যে, আমি বাস্তবিক পক্ষে ভয়াবহ পরাজয়ের জন্যই প্রার্থনা করিতেছিলাম। আমি সর্বদাই সংখ্যাল্পের দলে পড়িয়া আছি। দক্ষিণ আফ্রিকায় আমি একপ্রকার সর্বসম্মতিক্রমে আন্দোলন সুরু করিয়াছিলাম। পরে আমার সমর্থকের সংখ্যা মাত্র ৬৪, এমন কি ১৬তে নামিয়া আসিয়াছিল। কিন্তু পুনরায় আমি সেখানে বিপুল সংখ্যাধিক্য লাভ করি। জনবিরল সংখ্যাল্পতার মধ্যেই অধিক পরিমাণে কাজ হইয়াছিল।......আমি সমর্থন পাইতেছি, কেবল এই ভাবকেই যে সরকার ভয় করেন, তাহা আমি জানি। কিন্তু তাঁহারা জানেন না যে, তাঁহাদের অপেক্ষাও আমি সংখ্যাধিক্যকে অনেক বেশি ভয় করি। আমি, বস্তুতপক্ষে, নিজেও বিচারবুদ্ধিহীন জনসাধারণের স্তুতিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি। তাহারা যদি আমার গায়ে থুথু দেয়, তাহা হইলেই আমি বুঝিব যে আমার কর্তব্যে আমি অটল আছি। আমার এই 'একনায়কত্বের' সুযোগ লইবার বিরুদ্ধে আমার এক বন্ধু আমাকে সাবধান করিয়া দিয়াছেন। আমাকে অসৎভাবে ব্যবহার করিবার সুযোগ আমি অতর্কিতে দিয়াছি কিনা, তাহাও তখন হইতে ভাবিতে শুরু করিয়াছি। এ সম্বন্ধে আমি এমন ভীত হইয়া পড়িয়াছি যে, তেমনটি ইহার পূর্বে কখনও হই নাই, একথাও আমি স্বীকার করিতেছি। কিন্তু আমি নিরাপদ, ইহার একমাত্র কারণ, আমি নির্লজ্জ। কমিটিতে আমার বন্ধুদিগকে আমি সাবধান করিয়া দিয়াছি যে, আমাকে সংশোধন করা অসম্ভব। জনসাধারণ যতোবার ভুল করিবে, ততোবার আমি ভুল স্বীকার করিতেই থাকিব। পৃথিবীর একটিমাত্র অত্যাচারীর নিকট আমি মাথা নত করি। সে অত্যাচারী হইল আমার অন্তরের 'নীরব শান্ত বাণী।' এমন কি আমার সমর্থকদের সংখ্যাল্পতা যদি একে গিয়া পৌঁছিবার সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলেও হতাশাজনক সংখ্যাল্পতার মধ্যে থাকিবার

শক্তি যে আমার আছে, তাহা আমি সবিনয়েই বিশ্বাস করি। বাস্তবিক পক্ষে, এই একটি মাত্র অবস্থাই আমার পক্ষে সহজ এবং সত্য। আজ আমি দুঃখ পাইয়াছি। কিন্তু, আশা করি, জ্ঞানও লাভ করিয়াছি। বুঝিতেছি যে আমাদের অহিংসা-বোধ গভীর নহে। আমরা ঘৃণার জ্বালায় জ্বলিয়া মরিতেছি। গভর্নমেণ্ট নির্বুদ্ধিতার নানা কাজ করিয়া সে জ্বালায় ইন্ধন যোগাইতেছে। প্রায় এমনও মনে হইতেছে যে, গভর্নমেণ্ট যেন হত্যা, অগ্নিকাণ্ড ও অত্যাচারে ছাইয়া ফেলিতে চাহিতেছে!

"সুতরাং, এই অহিংসা যেন আমাদের সহায়হীনতার কারণেই, এইরূপ মনে হইতেছে। এমনও মনে হইতেছে যে, আমরা যেন প্রতিশোধ লইবার আকাঙ্ক্ষাকে বুকে লুকাইয়া লালন করিতেছি। কেবল একবার সুযোগ পাইলেই হয়। দুর্বলের চেষ্টাকৃত কৃত্রিম অহিংসা হইতে কি কখনো স্বেচ্ছাকৃত অকৃত্রিম অহিংসার উদ্ভব হইতে পারে? আমি কি এক অসম্ভব পরীক্ষা চালাইতেছি না? যদি, ক্ষিপ্ত আক্রোশ দেখা দিলেই নর-নারী-শিশু বিপন্ন হইয়া পড়ে, যদি মানুষ মানুষের বিরুদ্ধে হাত তুলে, তবে কি হইবে? তখন কী লাভ হইবে, যদি কখনো এমনই মহা বিপদ ঘটে এবং আমি অনশন করিয়া মৃত্যুকে বরণ করি? আসুন, মিথ্যা বলিয়া লাভ নাই। যদি বলপ্রয়োগের দ্বারাই আমরা স্বাধীনতা লাভ করিতে চাই, তবে আসুন, আমরা অহিংসা ত্যাগ করিয়া সাধ্যমতো হিংসাত্মক উপায় অবলম্বন করি। তাহাই পুরুষের মতো, সত্যবাদীর মতো এবং প্রকৃতিস্থের মতো হইবে। তখন কেহই আমাদিগকে ভণ্ডামির দুরন্ত অভিযোগে অভিযুক্ত করিতে পারিবে না।[৬৯]

"আমার সকল সতর্কবাণী সত্ত্বেও......অধিকাংশই যদি আমার লক্ষ্যে বিশ্বাস না করেন, যদিও তাঁহারা এই লক্ষ্যকে বিন্দুমাত্র পরিবর্তন না করিয়াই গ্রহণ করিয়াছিলেন, তবুও আমি তাঁহাদিগকে বলিতেছি, তাঁহারা যেন তাঁহাদের দায়িত্ব উপলব্ধি করেন। তাঁহাদিগকে আইন অমান্যের জন্য ঝাঁপাইয়া পড়িতে হইবে এমন কোনো কথা নাই। তাঁহারা গঠনমূলক নির্ঝঞ্ঝাট কাজে আত্মনিয়োগ করিতে পারেন। আমরা যদি এখন হইতে সাবধান না হই, তবে আমরা এমন জলে গিয়া পড়িব, যাহার গভীরতা সম্বন্ধে আমাদের কোনো ধারণাই নাই।

"যাঁহারা কংগ্রেসের মূল আদর্শে বিশ্বাস করেন না, তাঁহাদের অবশ্যই কংগ্রেস ত্যাগ করা উচিত।"

এবং সংখ্যাল্পদের দিকে ফিরিয়া গান্ধীজী বলেন :

"দেশপ্রেমের মনোভাবই সত্য এবং অহিংসার অবিচল অকুণ্ঠ আনুগত্য দাবি

---

৬৯ গান্ধীজী বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, অধিকাংশ সদস্য যাঁহারা অহিংসার পক্ষে ভোট দিয়াছেন, তাঁহাদের কেহ কেহ অন্তরে অন্তরে ইহাকে সাময়িকভাবে কার্যকরী রাজনীতিক অস্ত্র হিসাবেই দেখিতেছিলেন। ভাবিয়াছিলেন, এই অহিংসা গোপনে হিংসার পথ পরিষ্কার করিয়া দিবে। গান্ধীজীর মতে তাঁহারা, মিষ্ট করিয়া বলেন 'অহিংসার আঘাত হানো।' বহুদিন পূর্বে রবীন্দ্রনাথ যেমনটি ধরিতে পারিয়াছিলেন, গান্ধীজী এই বিপদটিকে তেমন ধরিতে পারেন নাই। কিন্তু এখন তিনি আতঙ্কিত হইয়া উঠিলেন, এবং রবীন্দ্রনাথের অপেক্ষাও কঠোর ভাবে সংখ্যাধিক্যের মনোভাবের নিন্দা এবং সমালোচনা করিলেন।

করিতেছে। যাঁহারা সত্যে এবং অহিংসায় বিশ্বাস করেন না, তাঁহাদের কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান হইতে বিদায় লওয়াই উচিত হইবে।"

এই বলিষ্ঠ কথাগুলির মধ্যে তিক্ত বেদনা আছে, কিন্তু সেই সঙ্গে আছে সুগঠিত পৌরুষ। ঐদিনই ছিল গেথ্‌সেমেনের রাত্রি। গান্ধীজীর গ্রেপ্তার আসন্ন। অন্তরে অন্তরে তিনি সেদিন এই বন্দিত্বকে মুক্তি বলিয়াই কামনা করিয়াছিলেন কিনা কে জানে!

দীর্ঘকাল ধরিয়া গান্ধীজী গ্রেপ্তার হইবার আশা করিতেছিলেন। সেই অনুসারেই ১৯২০-র ১০ই নভেম্বর হইতে তাঁহার কার্যাদির ব্যবস্থা হইতেছিল এবং তিনি নিজেকে এজন্য প্রস্তুতও করিতেছিলেন। 'আমি যদি গ্রেপ্তার হই' শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি জনসাধারণকে তাঁহার নির্দেশ জনাইয়া দিয়াছেন। ১৯২২ সালের ৯ই মার্চ তারিখে একটি প্রবন্ধে পুনরায় এই সম্ভাবনা সম্পর্কে তিনি উল্লেখ করেন। তখন তাঁহার গ্রেপ্তারের গুজব শুনা যাইতেছিল। তিনি বলেন যে, তিনি গভর্নমেণ্টকে ভয় করেন না। "গভর্নমেণ্ট রক্তের শত নদী বহাইয়া দিলেও আমি ভীত হইব না।" একটি মাত্র জিনিসকে তিনি ভয় করিতেছিলেন। সেটি হইল, তাঁহার গ্রেপ্তারের সংবাদ শুনিয়া জনসাধারণ যদি পথ হারাইয়া ফেলে! তাহা লজ্জার ব্যাপার হইবে। "জনসাধারণ পরিপূর্ণ আত্মসংযম পালন করিবেন এবং আমার গ্রেপ্তারের দিনকে উৎসব-আনন্দের দিন বলিয়া গ্রহণ করিবেন, আমি ইহাই কামনা করি। গভর্নমেণ্ট বিশ্বাস করেন যে সমগ্র আন্দোলনের মূলে রহিয়াছি আমি, এবং আমাকে সরাইতে পারিলেই আবার তাঁহারা শান্তিতে কাটাইতে পারিবেন। এখন কেবল জনসাধারণের শক্তির পরিমাণটুকু বুঝিতেই তাঁহাদের বাকী রহিয়াছে। জনসাধারণ অবিচলভাবে পূর্ণ শান্তি রক্ষা করুন। আমাকে গ্রেপ্তার করিলে পাছে দেশময় হাঙ্গামার উদয় হয়, এই ভয়ে সরকার যদি আমাকে গ্রেপ্তার করিতে ভয় পান, তবে তাহা আমার পক্ষে গর্বের বা আনন্দের বিষয় হইবে না, হইবে লজ্জার, লাঞ্ছনার। জনসাধারণ গঠনমূলক কর্মসূচীর সমগ্রটিই পালন করিতে থাকুন। কোনো প্রকার হরতাল, বিক্ষোভ-প্রদর্শন বা সরকারের সহিত সহযোগিতা যেন না হয়। বিচারালয় ও শিক্ষালয়গুলি বর্জন করিতে হইবে। সংক্ষেপে, পূর্ণ শান্তি এবং শৃঙ্খলার সহিত পালন করিতে হইবে অসহযোগের কর্মসূচী। জনসাধারণ যদি এই কর্মসূচী অনুসারে চলিতে পারেন, তবে তাঁহারা জয় লাভ করিবেন। অন্যথায় তাঁহাদিগকে মহাবিপদের সম্মুখীন হইতে হইবে।

যখন সমস্তই প্রস্তুত, তখন গান্ধীজী তাঁহার সাধের বিশ্রামস্থল, আমেদাবাদের নিকটস্থ শবরমতী আশ্রমে ফিরিয়া গেলেন এবং সেখানে প্রিয় শিষ্যদের মধ্যে থাকিয়া শান্তভাবে ধ্যান করিতে করিতে পুলিশ আসার প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। তিনি কাতরভাবে বন্দিত্বই কামনা করিতেছিলেন। তাঁহার অনুপস্থিতিতে ভারত তাহার উদ্দেশ্যকে দৃঢ়তরভাবে প্রকাশ করিবে। তাহা ছাড়া, তিনি বলেন, কারাগার তাঁহাকে "শান্তি এবং বিশ্রাম" দিবে। সম্ভবত এই বিশ্রামেরও তাঁহার প্রয়োজন ছিল।

১০ই মার্চের রাত্রিতে কনস্টবলরা আসিয়া পৌঁছিল। তাহাদের আসার সংবাদ

আগেই আশ্রমে পৌঁছিয়াছিল। মহাত্মা প্রস্তুত ছিলেন, তিনি নিজেকে পুলিশের হাতে ছাড়িয়া দিলেন। কারাগারে যাইবার পথে গান্ধীজী তাঁহার অন্যতম মুসলমান বন্ধু মওলানা হজরৎ মহম্মদের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। মওলানা বহুদূর হইতে গান্ধীজীকে বিদায়-আলিঙ্গন দিতে আসিয়াছিলেন। ইয়ং ইণ্ডিয়া পত্রিকার সম্পাদক ব্যাংকারকেও তাঁহার মনিবের সহিত কারাগারে পাঠানো হইল। গান্ধীজীর স্ত্রী কারাগারের দরজা পর্যন্ত স্বামীর সহিত যাইতে অনুমতি পাইলেন।

১৮ই মার্চ, শনিবার দুপুরে আমেদাবাদের জিলা ও সেসন জজ মিঃ সি.এন. ব্রুমফিল্ডের এজলাসে গান্ধীজীর 'মহাবিচার'[৭০] সুরু হইল। এই বিচারকালে যেমনটি হইয়াছিল, সেরূপ উদারতা ও মহানুভবতার দৃষ্টান্ত কদাচিৎ মিলে। অভিযুক্ত এবং বিচারক উভয়েই যেন সৌজন্যের প্রতিযোগিতা দেখাইতে লাগিলেন! এই সমগ্র সংগ্রামের মধ্যে ইংল্যান্ড কখনো এমন মহিমান্বিত নিরপেক্ষতা অবলম্বন করিতে পারে নাই। গভর্নমেণ্ট যে সমস্ত ত্রুটি করিয়াছিলেন, বিচারক ব্রুমফিল্ড তাহার অনেকখানিই শুধরাইয়া লইলেন। এই বিচার সম্বন্ধে প্রচুর লেখা হইয়াছে, তাই ইহার প্রধান বিষয়গুলিই আমি এখানে সংক্ষেপে উল্লেখ করিব।

গান্ধীজীকে সরকার কেন অবশেষে গ্রেপ্তার করিলেন? গ্রেপ্তার করিবার কথা দুই বৎসরেরও অধিককাল ভাবিবার পর, যখনই গান্ধীজী গণ-আন্দোলনকে নিরস্ত করিলেন এবং যখন তাঁহাকে হিংসাত্মক কার্যের একমাত্র প্রতিবন্ধক বলিয়া মনে হইতে লাগিল, সেই বিশেষ মুহূর্তেই কেন সরকার তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিবার কথা স্থির করিলেন? ইহা কি সরকারের ভুল মাত্র? গান্ধীজী বলিয়াছিলেন, "প্রায় এমনও মনে হইতেছে যে, গভর্নমেণ্ট যেন হত্যা, অগ্নিকাণ্ড ও অত্যাচার নিবারণের একমাত্র অধিকারী। এই অধিকার প্রমাণ করিবার জন্যই তাহারা যেন সমগ্র দেশকে হত্যা, অগ্নিকাণ্ড ও অত্যাচারে ডুবাইয়া ফেলিতে চাহিতেছেন।" সরকার কি গান্ধীজীর এই ভয়াবহ কথাগুলি প্রমাণ করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন? সরকারের উভয়সংকট। সরকার গান্ধীজীকে শ্রদ্ধাও করিতেন এবং ভয়ও করিতেন। গান্ধীজীর প্রতি কোমল ব্যবহার করিতে পারিলেই সরকার খুশী হইতেন। কিন্তু গান্ধীজী গভর্নমেণ্টের সহিত মোটেই ভাল ব্যবহার করেন নাই। তিনি হিংসার নিন্দা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার অহিংসা যে কোনো হিংসার অপেক্ষা অধিক বিপ্লবী। যেদিন তিনি ব্যাপক আইন অমান্য বন্ধ করিলেন, সেই দিনই, কিংবা বলা ভালো, ২৩শে ফেব্রুয়ারি তারিখে দিল্লীতে কংগ্রেস অধিবেশনের পূর্বদিন, তিনি এমন এক প্রবন্ধ লিখিলেন, যাহা গ্রেট বৃটেনের শক্তিকে অত্যন্ত আতঙ্কগ্রস্ত করিয়া তুলিল। লর্ড বার্কেনহেড এবং মিঃ মণ্টেগিউর নিকট হইতে একটি উদ্ধত টেলিগ্রাফ আসিয়া সমগ্র ভারতবর্ষকে আঘাত করিল।[৭১]

---

[৭০] "মহাবিচার"—ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২৩শে মার্চ, ১৯২২।

[৭১] "যদি আমাদের সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব বিপন্ন হইয়া উঠে, যদি বৃটিশ গভর্নমেণ্ট ভারতের প্রতি তাহার কর্তব্যপালনে ব্যাহত হন এবং যদি আমরা ভারত ছাড়িয়া চলিয়া আসিব এই ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হইয়া নানারূপ দাবি করা হইতে থাকে, তবে ভারতবর্ষ

গান্ধীজী এই স্পর্ধিত আহ্বান শুনিয়া ঘৃণায় ফাটিয়া পড়িলেন :

"বৃটিশ সিংহ যদি আমাদের মুখের উপর তাহার রক্তাক্ত থাবা নাড়িতে থাকে, তবে তাহার সহিত আমাদের আপোষ-মীমাংসা কেমন করিয়া সম্ভব? বৃটিশ সাম্রাজ্য শারীরিক দুর্বলতরদের সংগঠিত শোষণ এবং পশু-শক্তির অবিরাম প্রকাশের উপর ভিত্তি করিয়া প্রতিষ্ঠিত। বিশ্বের শাসনকর্তা ন্যায়বান বিধাতা বলিয়া যদি কেহ থাকেন, তবে তাহা কখনো টিকিয়া থাকিতে পারিবে না।...১৯২০ খৃীষ্টাব্দে যে যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল, সে যুদ্ধ যে এক মাস হউক, কিংবা এক বৎসর হউক, বহু বৎসর হউক, শেষ পর্যন্ত চলিবে, এখন বৃটিশ জনসাধারণের তাহা উপলব্ধি করিবার উপযুক্ত সময় আসিয়াছে। আমি কেবল আশা করি এবং ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি যে, শেষ পর্যন্ত অহিংস থাকিবার মতো প্রচুর দীনতা এবং পর্যাপ্ত শক্তি যেন ভারতের থাকে। টেলিগ্রাফ যোগে এখন যে সমস্ত সদম্ভ উক্তি পাঠানো হইতেছে, তাহার নিকট মাথা নত করা সম্পূর্ণ অসম্ভব।"

এই প্রবন্ধে এবং অন্য দুইটি প্রবন্ধে লিখিত কয়েকটি উক্তির অভিযোগে গান্ধীজী অভিযুক্ত হইলেন। অন্য প্রবন্ধ দুইটির একটি ১৯২১-এর ১৯শে সেপ্টেম্বর এবং অপরটি ১৯২১-এর ১৫ই ডিসেম্বর তারিখে লিখিত হয়। প্রথমটিতে আলি ভাইদের গ্রেপ্তারের উল্লেখ ছিল, দ্বিতীয়টিতে ছিল লর্ড রীডিং-এর বক্তৃতার উত্তর। উভয় প্রবন্ধে একই ঘোষণা ছিল অসমাপ্ত যুদ্ধের। "আমরা চাই স্বরাজ। আমরা চাই সরকার জনসাধারণের ইচ্ছার নিকট মাথা নত করুক। আমরা আর শান্তি চাহি না। প্রত্যাশা করি না।" সুতরাং গান্ধীজীর বিরুদ্ধে অভিযোগ আসিল যে, "তিনি সরকারের প্রতি অনানুগত্যের প্রচার করিয়াছেন এবং সরকারের উচ্ছেদ সাধন করিতে অপরকে প্রকাশ্যে প্ররোচিত করিয়াছেন।" গান্ধীজী নিজেই নিজের পক্ষ সমর্থন করিলেন। তিনি এই অপরাধগুলি স্বীকার করিলেন।

বোম্বাইয়ের এডভোকেট জেনারেল সার জে. টি. স্ট্রংম্যান বলিলেন যে, অভিযোগে যে তিনটি প্রবন্ধের উল্লেখ করা হইয়াছে, সেগুলি কোন প্রকার বিচ্ছিন্ন বস্তু নহে। সেগুলি দীর্ঘ দুই বৎসর ধরিয়া গভর্নমেণ্টকে বিপর্যস্ত করিবার উদ্দেশ্যে পরিচালিত একটি অভিযোগের অংশ মাত্র। তিনি এই প্রবন্ধগুলি হইতে বিভিন্ন অংশ উদ্ধৃত করিলেন। তিনি গান্ধীজীর উন্নত চরিত্রের প্রশস্তিও গাহিলেন। কিন্তু এই প্রশস্তি কেবলমাত্র এই প্রবন্ধগুলির উপর দায়িত্ব আরোপ করিল। সুতরাং, ইহার অনিষ্টকর প্রভাবকে বাড়াইয়া দেখাইল। সার জে. টি. গান্ধীজীকে বোম্বাই এবং চৌরি-চৌরার রক্তপাতের জন্যও দায়ী করিলেন। গান্ধীজী অহিংসার প্রচার করিতেছিলেন সত্য, কিন্তু তিনি অনানুগত্যের কথাও বলিতেছিলেন। সুতরাং জনসাধারণ যে দাঙ্গা-হাঙ্গামা করিয়াছে, সেজন্য তিনিই দায়ী।

ইংরেজদের সহিত পারিয়া উঠিবে না। কারণ ইংরেজরা সর্বাপেক্ষা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ জাতি। তাহারা আবার একবার ভারতকে জবাব দিবার জন্য তাহাদের সমস্ত শক্তি ও সংকল্পকে নিয়োগ করিবে।"

গান্ধীজী বলিবার অনুমতি চাহিলেন। কোন্‌টি ভুল পথ এবং কোন্‌টি নির্ভুল পথ, এই সম্পর্কে তিনি যে দ্বন্দ্ব-নির্যাতন ভোগ করিতেছিলেন, তিনি কোন্ পথ অবলম্বন করিলেন এবং তাহার ফল জনসাধারণের উপর কিরূপ হইবে, সে সম্বন্ধে গত কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া যে বেদনা, যে সংশয়, যে মানসিক, আধ্যাত্মিক সংঘাত তিনি সহিতেছিলেন, তাহা সমস্তই পরিষ্কার হইয়া গেল। তিনি তাঁহার আত্মার শান্তি ফিরিয়া পাইলেন। যাহা কিছু ঘটিয়াছে বা ঘটিতে পারে, তাহাকেই তিনি প্রয়োজন বলিয়া গ্রহণ করিলেন, সে প্রয়োজনের জন্য তিনি দুঃখিত হইতে পারেন, তথাপি সে প্রয়োজন তাঁহাকে সহিতেই হইবে। তিনি এডভোকেট জেনারেলের সহিত একমত হইলেন। হ্যাঁ, তিনিই দায়ী। সমস্ত কিছুর জন্যই তিনি দায়ী। অভিযোগে যাহা বলা হইয়াছে, তাহার অপেক্ষা অনেক বেশি সময় তিনি অনানুগত্য সম্পর্কে প্রচার করিয়াছেন। মাদ্রাজের গোলযোগ, চৌরি-চৌরার "দানবীয় অপরাধ" এবং বোম্বাইয়ের "উন্মত্ত অত্যাচার" এ সমস্তর জন্য তিনিই দায়ী।

"বিচক্ষণ এডভোকেট জেনারেল ঠিকই বলিয়াছেন। আমি একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তি, যথেষ্ট শিক্ষালাভ করিয়াছি এবং জাগতিক ব্যাপারে আমার অভিজ্ঞতাও রহিয়াছে প্রচুর। সুতরাং আমার প্রতিটি কাজের ফলাফল কি হইবে, তাহা আমার জানা উচিত ছিল। আমি জানিতাম যে, আমি আগুন লইয়া খেলা করিতেছি, তাহার বিপদের দায়িত্বও আমি গ্রহণ করিয়াছি। আমি যাহা করিয়াছি, মুক্তি পাইলে আমি আবার তাহাই করিব। আজ সকালে আমি অনুভব করিলাম, আমি এখন যাহা বলিতেছি, তাহা না বলিলে আমার কর্তব্যের ত্রুটি হইবে।

"আমি হিংসা এড়াইতে চাহিয়াছিলাম। আমি হিংসা এড়াইতে চাই। আমার নীতির প্রথম সূত্র অহিংসা, শেষ সূত্র অহিংসা। কিন্তু আমাকে বাছিয়া লইতে হইয়াছে। হয় আমাকে এমন এক ব্যবস্থার নিকট মাথা নত করিতে হইবে, যাহা আমার দেশের অপূরণীয় অনিষ্ট করিয়াছে বলিয়া আমার বিশ্বাস, নয় আমাকে বরণ করিতে হইবে সেই জনতাকে—যে-জনতা আমার মুখ হইতে সত্য উপলব্ধি করিয়া উন্মত্ত আক্রোশে ফাটিয়া পড়িবে! আমি সেজন্য গভীরভাবে দুঃখিত। আমি তাই এখানে লঘু কোনো শাস্তি নহে, কঠিনতম শাস্তি গ্রহণের জন্যই উপস্থিত হইয়াছি। আমি করুণা চাহি না। কঠোরতার লাঘবের জন্যও প্রার্থনা করিতেছি না। আমি এখানে কঠিনতম শাস্তি সানন্দে গ্রহণের জন্যই উপস্থিত হইয়াছি।...বিচারক, আপনার কাছে এখন একটি মাত্র পথ উন্মুক্ত রহিয়াছে। হয় আপনাকে নিজেকে পদত্যাগ করিতে হইবে, নয় আমাকে কঠিনতম শাস্তি দিতে হইবে।"

ধর্মভীরু বিবেকবান মনোভাব এবং রাজনীতিক নেতার বীর্যবান দৃঢ়তার সামঞ্জস্যে বলিষ্ঠ এই অভিভাষণের পর গান্ধীজী ভারত ও ইংল্যাণ্ডের জনসাধারণের উদ্দেশ্যে একটি লিখিত ঘোষণা পাঠ করিলেন। বলিলেন, কেন তিনি অনুগততম সহযোগী হইতে চরমপন্থী অননুগততম অসহযোগী হইয়া উঠিলেন, সে সম্বন্ধে জনসাধারণের কাছে তাঁহার কৈফিয়ত দেওয়ার প্রয়োজন আছে। গান্ধীজী ১৮৯৩ সাল হইতে আজ পর্যন্ত তাঁহার রাজনীতিক জীবন সম্বন্ধে আলোচনা করিলেন।

তিনি একজন ভারতীয় হিসাবে বৃটিশ শাসন-ব্যবস্থার নিকট কিরূপ নির্যাতন পাইয়াছেন এবং গত পঁচিশ বৎসর যাবৎ এই শাসন-ব্যবস্থার সংস্কার করিতে তিনি কী অবিরাম চেষ্টা করিতেছেন, সে বিষয়েও তিনি বিশেষভাবে উল্লেখ করিলেন। তিনি এখনো দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে, ভারতকে ইংল্যান্ড হইতে বিচ্ছিন্ন না করিয়াও এই শাসন-ব্যবস্থার সংস্কার সম্পূর্ণ সম্ভব। সকল প্রকার প্রতারণা সত্ত্বেও তিনি ১৯১৯ সাল পর্যন্ত বৃটিশের সুবিশ্বস্ত সহযোগীই ছিলেন। কিন্তু তাহার পর হইতেই বৃটিশের অত্যাচার এবং অপরাধ সীমা অতিক্রম করিয়াছে এবং সমস্ত অন্যায়ের ক্ষতিপূরণের পরিবর্তে গভর্নমেণ্ট যেন ভারতের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার ইচ্ছাতেই সমস্ত অপরাধী কর্মচারীদিগকে সম্মানিত এবং পুরস্কৃত করিয়াছেন, পেন্সন দিয়াছেন। গভর্নমেণ্ট নিজের হাতেই সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়াছেন। অবশেষে গান্ধীজী এই সিদ্ধান্তে আসিয়াছেন যে, এমন কি, এখন যদি সরকার বাঞ্ছিত সংস্কারগুলির প্রস্তাব করেন, তাহাও ক্ষতিকর হইবে। ভারতের বৃটিশ গভর্নমেন্ট জনসাধারণের শোষণের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই শোষণকে শক্তিশালী করিবার মতলবেই কেবল আইন পাস হয়। আইনের প্রয়োগকে শোষকদের স্বার্থের জন্য সচেতনভাবে বা অচেতনভাবে পণ্যবৃত্তিতে পরিণত করা হইয়াছে। সূক্ষ্ম অথচ কার্যকরী সন্ত্রাস-ব্যবস্থা এবং শক্তির সুব্যবস্থিত প্রদর্শনের ফলেই জনসাধারণ ভীরু ও পৌরুষহীন হইয়া পড়িয়াছে। "তাহাদের মধ্যে ভান করিবার অভ্যাস দেখা দিয়াছে।" ভারত অনাহারে রহিয়াছে, ধ্বংস হইয়াছে, অধঃপাতে গিয়াছে। অনেকে এইরূপ দাবিও করিতেছেন যে, ডোমিনিয়ন পরিকল্পনায় স্বায়ত্ত শাসনের অধিকারী হইতে ভারতের আরো কয়েক পুরুষ লাগিবে। ইংল্যান্ড ভারতের যে পরিমাণ ক্ষতি করিয়াছে, তাহার পূর্বে আর কোনো ব্যবস্থাই সেরূপ করে নাই। অমঙ্গলের সঙ্গে অসহযোগিতাই কর্তব্য। গান্ধীজী তাঁহার কর্তব্য করিয়াছেন। কিন্তু অতীতকালে অসহযোগ প্রকাশ পাইত অপরাধীর উপর বলপ্রয়োগ করিয়া। তখন বলপ্রয়োগ বা হিংসাই ছিল শ্রেষ্ঠতম অস্ত্র। গান্ধীজী জনসাধারণকে নূতন অস্ত্র দিয়াছেন। নূতন, কিন্তু দুর্জয়। সে অস্ত্র অহিংসার।

এইবার বিচারক ব্রুমফিল্ড এবং মহাত্মার মধ্যে সৌজন্যের প্রতিযোগিতা শুরু হইল।

"মিঃ গান্ধী, আপনি অভিযোগগুলিকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়া একপ্রকারে আমার কর্তব্যকে সহজ করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু তথাপি যাহা বাকী রহিয়াছে, অর্থাৎ ন্যায় দণ্ডাদেশ স্থির করা সেদিক হইতে এ দেশে বিচারকদের যে অসুবিধায় পড়িতে হয়, আমাকেও বোধ হয় সে অসুবিধারই সম্মুখীন হইতে হইতেছে।.........আপনার কোটি কোটি স্বদেশবাসীর চক্ষে আপনি যে একজন মহান্ দেশপ্রেমিক এবং একজন মহান্ জননায়ক, এই ব্যাপারটি অস্বীকার করা অসম্ভব। এমন কি আপনার সহিত রাজনীতিতে যাঁহাদের মতদ্বৈধ রহিয়াছে, তাঁহারা-ও আপনাকে মহানুভব, উচ্চ আদর্শসম্পন্ন, ঋষিতুল্য ব্যক্তি বলিয়াই মনে করেন।......কিন্তু আইন অনুসারে আপনার বিচার করিতে হইবে; ইহাই আমার

কর্তব্য।......কোনো সরকারের পক্ষে আপনাকে মুক্ত রাখা আপনি অসম্ভব করিয়া তুলিয়াছেন, এই কথা ভাবিয়া অকপটে দুঃখ প্রকাশ করেন নাই, এমন লোক ভারতবর্ষে কদাচিৎ আছেন। জনসাধারণের স্বার্থের জন্য কি প্রয়োজন বলিয়া আমার মনে হয়, এবং কি আপনার যথার্থ প্রাপ্য, আমি এই দুইটি বিষয়ের ভারসাম্য করিতেছি।”

কি দণ্ডাদেশ দেওয়া হইবে, সে সম্বন্ধে জজ ব্রুমফিল্ড প্রচুর সৌজন্যের সহিত গান্ধীজীর পরামর্শ লইলেন। “আপনাকে যদি মিঃ তিলকের শ্রেণীভুক্ত করি, তাহা হইলে আমার মনে হয়, আপনি তাহাকে অযৌক্তিক বিবেচনা করিবেন না।” বারো বৎসর পূর্বে তিলকের ছয় বৎসর কারাদণ্ড হইয়াছিল। “যদি ভারতের ঘটনার ধারা গভর্নমেণ্টের পক্ষে এই দণ্ডকাল কমাইয়া আপনাকে মুক্ত করা সম্ভব করে, তবে আমি যেমনটি আনন্দিত হইব, তেমনটি আর কেহই হইবেন না।”

গান্ধীজীও সৌজন্যে জজের নিকট হার মানিলেন না। বলিলেন, তিলকের সহিত নিজের নাম সংযুক্ত হওয়াকে তিনি শ্রেষ্ঠ সম্মান ও অতুলনীয় গৌরব বলিয়াই মনে করেন। এবং দণ্ডাদেশ সম্বন্ধে তিনি বলিলেন যে, ইহাকে তিনি অত্যন্ত লঘু বলিয়াই মনে করেন। কোনো বিচারকের পক্ষে ইহার অপেক্ষা লঘুতর দণ্ড দেওয়া সম্ভব ছিল না। বিচারের সমগ্র ধারাটি সম্পর্কে গান্ধীজী বলিলেন যে, ইহার অপেক্ষা অধিক সৌজন্য তিনি আশা করেন নাই।[৭২]

---

৭২ ইয়ং ইণ্ডিয়ার সম্পাদক মিঃ ব্যাংকার বিচারের সময় গান্ধীজীরই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া সকল বিবৃতিই স্বীকার করিয়া লইলেন। ফলে তাঁহার এক বৎসরের কারাদণ্ড এবং কিঞ্চিৎ অর্থদণ্ড হইল।

শ্রীমতী কস্তুরাবাঈ গান্ধী একটি সুন্দর বাণীতে ভারতের জনসাধারণকে গান্ধীজীর দণ্ডাদেশের কথা জানাইলেন। তিনি তাহাদিগকে শান্ত থাকিতে এবং নীরবে গান্ধীজীর গঠনমূলক কর্মসূচী পালন করিতে বলিলেন।

গান্ধীজী শবরমতী জেলে থাকিলেন না। সেখানে সবাই তাঁহার সহিত ভালো ব্যবহার করিতেছিল। গান্ধীজী সেখান হইতে এক অজ্ঞাত জেলে স্থানান্তরিত হইলেন। অতঃপর সেখান হইতে পুনার নিকটস্থ যারবেদা জেলে। ১৯২২ সালের ১৮ই মে তারিখে ইউনিটি পত্রিকায় ‘কারাগারে গান্ধী’ শীর্ষক প্রবন্ধে এন. ডি. হার্দিকর যে বিবৃতি প্রদান করেন, তাহার সত্যাসত্য আমরা মিলাইয়া দেখিতে না পাইলেও তাহাতে বলা হয় যে, গান্ধীজীকে সাধারণ কয়েদীর মতোই একটি কোটরে রাখা হইয়াছে এবং তাঁহাকে কোনো প্রকার সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হইতেছে না। ইহাতে বলা হয় যে, এই ব্যবস্থায় গান্ধীজীর দুর্বল শরীরের ক্ষতি হইয়াছে।

মিঃ সি. এফ. এনড্রিউজ গান্ধীজীর কারাবাস প্রসঙ্গে আমাকে বলেন যে, মহাত্মা কারাগারে প্রফুল্লচিত্ত ছিলেন। তাঁহার বন্ধুদিগকে তিনি তাঁহার সহিত দেখা করিতে নিষেধ করেন। তিনি নিজেকে শুদ্ধ করিতেছিলেন; তিনি উপাসনা করিতেন এবং তাঁহার দৃঢ় ধারণা জন্মিয়াছিল যে, এইভাবে তিনি ভারতের জন্য সর্বাপেক্ষা ফলপ্রদভাবে কাজ করিতেছেন।

কথা প্রসঙ্গে মিঃ এনড্রিউজ বলেন যে, মহাত্মার কারাবাসের ফলে ভারতে মহাত্মার অনুগামীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। ভারতবর্ষ এখন পূর্বের অপেক্ষাও অধিকতর উৎসাহের সহিত গান্ধীজীকে বিশ্বাস করে। ভারতবর্ষ গান্ধীজীকে শ্রীকৃষ্ণের অবতার বলিয়া গ্রহণ করিতে চায়। শ্রীকৃষ্ণকেও কারাগারের পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইতে হইয়াছিল। গান্ধীজী মুক্ত

বিচার শেষ হইয়া গেল। গান্ধীজীর বন্ধুবান্ধবগণ কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার পায়ের তলায় লুটাইয়া পড়িলেন। মহাত্মা হাসিমুখে তাঁহাদের নিকট বিদায় লইলেন। এবং তাঁহার পশ্চাতে শবরমতী কারাগারের দ্বার রুদ্ধ হইয়া গেল।

তখন হইতেই এই মহর্ষির বাণী স্তব্ধ হইয়াছে। তাঁহার দেহ রুদ্ধ হইয়াছে যেন একটি কবরের মধ্যে, যদিও কবর কখনো কোনো চিন্তাকে বন্দী রাখে না। গান্ধীজীর অদৃশ্য আত্মা আজও ভারতের বিশাল দেহকে প্রাণচঞ্চল করিয়া তুলিতেছে। রুদ্ধ কারাগার হইতে যে একমাত্র বাণী আসিয়াছে, তাহা হইল "শান্তি, অহিংসা এবং সহিষ্ণুতা।" এই বাণী শ্রুত হইয়াছে। এই সংকেতবাণী প্রেরিত হইয়াছে, ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে। তিন বৎসর পূর্বে গান্ধীজীর গ্রেফ্‌তারে দেশ হয়তো রক্তাপ্লুত হইয়া যাইত। ১৯২০ সালে কেবলমাত্র ইহার সংবাদ শুনিয়াই জনসাধারণের মধ্যে হাঙ্গামা বাধিয়া গিয়াছিল। কিন্তু আমেদাবাদের দন্ডাদেশ উপাসনার শান্ত গাম্ভীর্যের সহিত গৃহীত হইল। লক্ষ লক্ষ ভারতীয় প্রফুল্ল স্তব্ধতার সহিত কারাবরণ করিলেন। অহিংসা এবং সহিষ্ণুতা—অপেক্ষাকৃত একটি বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত হইতে বুঝা যাইবে যে, এই দুইটি দৈববাণী ভারতের অন্তরে কী গভীরেই না প্রবেশ করিয়াছিল!

শিখেরা ভারতে সমরনিপুণ জাতি বলিয়া সর্বদা পরিচালিত, একথা সকলেই জানেন। যুদ্ধের সময় তাঁহারা বহুসংখ্যায় সৈন্যবাহিনীতে কাজ করিয়াছেন, যদিও তাঁহাদের দান পাশ্চাত্যীয়দের চোখে সামান্য মাত্র। ধর্মসংক্রান্ত এক উদ্দীপনার ফলে আকালি নামে এক শিখ সম্প্রদায় ধর্মস্থানগুলিকে শুদ্ধ করিতে চাহিল। কিন্তু এই ধর্মস্থানগুলি কয়েকজন কুখ্যাত রক্ষকের কবলে ছিল। তাহারা প্রবল-বেগে বাধা দিতে লাগিল। আইনের জন্য গভর্নমেণ্টও তাহাদের পক্ষ লইলেন। ১৯২২-এর আগস্ট মাসে প্রতিদিন গুরু-কা-বাগে[৭০] বহুলোক শহীদ হইতে লাগিলেন। আকালিরা নির্বিরোধিতার মন্ত্র গ্রহণ করিলেন। এক হাজার লোক ধর্মস্থানগুলির আশেপাশে বাসা বাঁধিলেন এবং চারি হাজার লোক আশ্রয় লইলেন দশ মাইল দূরে অমৃতশহরের 'সুবর্ণ মন্দিরে।' প্রতিদিন ঐ চারি হাজারের একশত করিয়া লোক—তাঁহাদের অধিকাংশেরই যুদ্ধে যাইবার বয়স, অনেকে যুদ্ধে গিয়াছিলেন-ও—চিন্তায় বা কার্যে অহিংসার মন্ত্রচ্যুত না হইতে শপথ গ্রহণ করিলেন এবং গুরু-কা-বাগের পার্শ্বস্থ সহস্র স্বেচ্ছাসেবকের মধ্য হইতে প্রতিদিন পঁচিশজন করিয়া ঐ একই শপথ লইলেন। ধর্মস্থান হইতে অদূরে পুলের উপর এই বিক্ষোভ

থাকিয়া যে হিংসার বিস্ফোরণকে এড়াইতে পারিবেন কিনা ভয় পাইতেছিলেন, কারাগারে থাকিয়া তিনি তাহা সম্পূর্ণরূপে নিবারণ করিতে পারিলেন।

১৯২২ সালের ৩রা আগস্ট তারিখে ইউনিটি পত্রিকায় "কারাগারের পত্র" প্রকাশিত হয়। এই পত্রে গান্ধীজী আধুনিক সভ্যতার অনিষ্টকারিতা সম্পর্কে আলোচনা করেন। এই পত্রখানি আমার নিকট শাস্ত্রোক্ত বাক্যের মতো লাগে। আমার মনে হয়, ইহা কিছুদিন পূর্বে লিখিত, বিশেষ করিয়া 'হিন্দ স্বরাজে' লিখিত, প্রবন্ধগুলির সংক্ষিপ্তসার।

৭০ গুরু-কা-বাগ, গুরুদ্বারের অন্যতম ধর্মস্থান।

প্রদর্শন থামাইবার জন্য লোহার-গুল-লাগানো লাঠি-হাতে পুলিশ কনস্টবলেরা অপেক্ষা করিতেছিল। প্রতি দিনই হইতেছিল এক বিভীষিকাময় মর্মান্তিক ঘটনার অনুষ্ঠান। রবীন্দ্রনাথের বন্ধু মিঃ এনড্রিউজ তাঁহার অবিস্মরণীয় প্রবন্ধ 'আকালি সংগ্রাম'-এ ইহার বর্ণনা দিয়াছেন।[৭৪] কালো পাগড়িতে সাদাফুলের ছোটো মালা পরিয়া আকালিরা নিঃশব্দে কনস্টবলদের সম্মুখে আসিতে লাগিলেন এবং গজখানেক দূরে দাঁড়াইয়া নীরব নিথর হইয়া প্রার্থনায় মন দিলেন। তাঁহাদিগকে ভাগাইবার জন্য কনস্টবলেরা লোহার-গুলওয়ালা ডান্ডা দিয়া আঘাত করিতে লাগিল। আঘাত কঠিন হইতে কঠিনতর হইল। রক্তের ধারা বহিল। আকালিরা মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। যাঁহারা পায়ে ভর করিয়া আবার উঠিয়া দাঁড়াইতে পারিলেন, তাঁহারা পুনরায় প্রার্থনা শুরু করিলেন। পুনরায় প্রহার খাইয়া মূর্ছিত হইয়া না পড়া পর্যন্ত প্রার্থনা চলিতে থাকিল। কাহাকেও আর্তনাদ করিতে বা ক্রুদ্ধ দৃষ্টি হানিতে এনড্রিউজ দেখেন নাই। নিকটেই দর্শকের জনতা নীরবে প্রার্থনা করিতেছিল। স্তব্ধ বেদনা ফুটিয়া উঠিতেছিল তাহাদের সকলের মুখে। এনড্রিউজ বলেন, "আমি ক্রুশের ছায়ার কথা না ভাবিয়া পারিতেছিলাম না।" ইংরেজরাও তাঁহাদের কাগজে এই দৃশ্যের বর্ণনা দিলেন এবং প্রগাঢ় বিস্ময় প্রকাশ করিলেন।[৭৫] ইহা বৃটিশের নিকট দুর্বোধ্য মনে হইল। যদিও তাঁহাদের স্বীকার করিতে হইল যে, অসহযোগ এবং অহিংসার আদর্শ ক্রমশঃ প্রভাব বিস্তার করিতেছে এবং পাঞ্জাবের জনসাধারণ এই মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছেন। এনড্রিউজের উদার মনোভাব এবং অনাবিল আদর্শ তাঁহাকে ভারতের আত্মাকে চিনিতে সমর্থ করিয়াছিল। তিনি বলেন যে, গ্যেটে যেমন ভালমিতে "নবযুগের অরুণোদয়" প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, তিনিও এখানে তেমনিই দেখিয়াছেন। "দুঃখের দ্বারা, সহনের দ্বারা আয়সীকৃত অভিনব এক বীর্যের অভ্যুত্থান ঘটিয়াছে, জন্ম হইয়াছে এক আধ্যাত্মিক যুদ্ধের।"

মনে হইবে যেন যাঁহারা ভারতের জনসাধারণকে পথ দেখাইবার আদর্শ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের অপেক্ষা ভারতের জনসাধারণই গান্ধীজীর নীতিকে অধিকতর বিশ্বাসের সহিত গ্রহণ করিয়াছে! গান্ধীজীর গ্রেফ্‌তারের বিশ দিন পূর্বে দিল্লীতে কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে গান্ধীজী যে বিরোধিতার সম্মুখীন হইয়াছিলেন, তাহা আমি আগেই বলিয়াছি। ১৯২২ সালের ৭ই জুন তারিখে লক্ষ্ণৌ-এ কমিটির যখন পুনরায় অধিবেশন হইল, তখনো এই বিরোধিতা দেখা যাইতেছিল। গান্ধীজী যে সধৈর্য প্রতীক্ষা এবং নীরব গঠনমূলক কর্মসূচীর প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা ভয়ানকভাবে তিরস্কৃত হইল। আইন অমান্য ঘোষণার দাবি করিয়া একটি প্রস্তাবও আসিল। দেশ আইন অমান্যের জন্য প্রস্তুত হইয়াছে কিনা তাহার তদন্ত করিবার উদ্দেশ্যে একটি কমিশন নিয়োগ করা হইল। এই কমিশনটি সমস্ত ভারত পরিভ্রমণ করিয়া শরৎকালে একটি নিরুৎসাহ রিপোর্ট দাখিল করিল।

---

[৭৪] শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক এনড্রিউজের 'আকালি সংগ্রাম' মাদ্রাজের 'স্বরাজ্য' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। পরে পুস্তিকা আকারেও প্রকাশিত হইয়াছে।

[৭৫] মাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান উইকলি, ১৩ই অক্টোবর, ১৯২২।

আইন অমান্য যে বর্তমানে অসম্ভব বলা হইল, তাহাই নহে, প্রায় অর্ধেক সংখ্যক সদস্য এমন চরমভাবে রক্ষণশীল হইয়া উঠিলেন যে, তাঁহারা বলিলেন গান্ধীজীর অসহযোগের নীতিও এখন পরিত্যাগ করা দরকার এবং সরকারী কাউন্সিলের মধ্যে একটি নূতন স্বরাজ দল গঠন করা উচিত। অর্থাৎ যাঁহারা হিংসায় বিশ্বাসী তাঁহারা এবং যাঁহারা বিচক্ষণতায় বিশ্বাসী তাঁহারা, উভয় দলই গান্ধীজীর নীতিকে আক্রমণ করিতে লাগিলেন।

ভারতবর্ষ কিন্তু কমিশনের এই রিপোর্ট গ্রহণ করিল না। ১৯২২-এর ডিসেম্বরে যে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন হইল, তাহাতে কংগ্রেস তাঁহাদের নির্যাতিত গুরুদেব এবং তাঁহার অসহযোগের বাণীর প্রতিই পরিপূর্ণ আনুগত্য জানাইলেন। কাউন্সিলে যোগদানের প্রস্তাবকে কংগ্রেস ৮৯০ ভোটের বিরুদ্ধে ১৭৪০ ভোটে বাতিল করিয়া দিলেন। যাঁহারা হিংসায় বিশ্বাস করিতেন, তাঁহাদের সংখ্যা ছিল অতি অল্প, এবং প্রভাব ছিল নগণ্য। গান্ধীজী যে রাজনীতিক ধর্মঘটের আদেশ দিয়াছিলেন, তাহা পালনের অনুরোধ জানাইয়া সর্বসম্মতি-ক্রমে কংগ্রেস একটি প্রস্তাব পাস করিয়া অধিবেশন শেষ করিলেন। ইউরোপীয় শ্রমিকরা যাহাতে অসন্তুষ্ট না হন, সেই উদ্দেশ্যে অবশ্য কংগ্রেস বিলাতী মাল বয়কটের প্রস্তাবকে বাতিল করিয়া দিলেন। কিন্তু মুসলমানদের খিলাফত সম্মিলন স্বাভাবিক দম্ভের সহিত বিলাতী মাল বর্জনের প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন বিপুল ভোটাধিক্যে।

গান্ধীবাদী আন্দোলনের বিবরণ আমাদের এখানেই শেষ করিতে হইবে, স্বয়ং মহাত্মার এবং তাঁহার শ্রেষ্ঠ শিষ্যগণের অনুপস্থিতিতে। শিষ্যরাও মহাত্মার মতোই বন্দী হইয়াছিলেন (বিশেষ করিয়া আলি ভাইরা)। কয়েকটি অনিবার্য ভুলত্রুটি ঘটিল। তাহা ভিন্ন এই আন্দোলন প্রথম বৎসরে নেতাহীন অবস্থাতেই সাফল্যের সহিত বহু পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইতে পারিল। ১৯২২ সালে গয়ায় কংগ্রেস অধিবেশন শেষ হইলে ইংরেজী সংবাদপত্রগুলি আন্দোলনের অগ্রগতিতে যেমন বিস্মিত, তেমনিই হতাশ হইল।

এখন কি হইবে? অতীত অভিজ্ঞতা হইতে জ্ঞান লাভ করিয়া ইংল্যান্ড কি ভারতীয় জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে গড়িয়া তুলিতে শিখিবে এবং ভারতের জনসাধারণও কি তাঁহাদের আদর্শে চিরদিন আস্থা রাখিতে পারিবেন? জাতির স্মৃতি বড়োই দুর্বল। গান্ধীজীর মতবাদ যদি ভারতীয় জাতির গভীরতম এবং প্রাচীনতম কামনার প্রকাশ না হইত, তবে ভারত যে গান্ধীজীর শিক্ষার প্রতি অধিককাল আসক্ত থাকিবে, এমন স্বল্পতম বিশ্বাসও আমার থাকিত না। কারণ, পারিপার্শ্বিক আদর্শের সহিত মিল না রাখিয়া ব্যক্তিগত ক্ষমতার দ্বারা যদি-বা কোনো প্রতিভার জন্ম সম্ভব হয়, যাঁহার মধ্যে সমগ্র জাতির কামনা-প্রবৃত্তি প্রতি-ফলিত হয় না, যিনি সময়ের প্রয়োজন মিটাইতে পারেন না, যিনি বিশ্বের আকাঙ্ক্ষার দাবীপূরণে অসমর্থ, এমন কোনো কর্মী প্রতিভার বা নেতার জন্ম অসম্ভব।

এই সমস্ত জ্ঞানই গান্ধীজীর ছিল। তাঁহার অহিংসার মতবাদ দুই হাজার

বৎসরেরও অধিককাল ধরিয়া ভারতের অন্তরলোকে মুদ্রিত হইয়া আছে। মহাবীর, বুদ্ধ এবং বৈষ্ণব সম্প্রদায় অহিংসাকে কোটি কোটি মানুষের আত্মার অন্তরতম বস্তু করিয়া তুলিয়াছেন। গান্ধীজী কেবল ইহার মধ্যে শৌর্যের সংযোগ করিয়াছেন মাত্র। অতীতকালের যে মহাবাণী, যে মহাশক্তি মুমূর্ষু স্থবির হইয়া পড়িয়াছিল, তিনি কেবল তাহাকে আহ্বান করিয়া সচকিত সঞ্জীবিত করিয়া তুলিয়াছেন। এই বাণী, এই শক্তি, তাঁহার মধ্যে আপনাকে খুঁজিয়া পাইয়াছে। কিন্তু গান্ধী কেবল বাণীই নহে, তিনি বাণীর-ও অধিক, তিনি দৃষ্টান্ত। তিনি জনসাধারণের অন্তরাত্মার প্রতিমূর্তি। যে মানুষের মধ্যে সমগ্র জাতি সমাধি লাভ করে, সমগ্র জাতি পুনর্জীবিত হয়, ধন্য সেই মানুষ। কিন্তু এই প্রকারের পুনর্জাগরণ কখনো অকারণ হয় না, অবান্তর হয় না। আজ ভারতের মন্দির ও অরণ্য হইতে ভারতের আত্মা শক্তিতে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। তাহার কারণ, সমগ্র বিশ্ব আজ যে বাণীর জন্য আর্ত-ব্যথিত হইয়া উঠিয়াছে, সেই বাণী বহন করিতেছে এই ভারতবর্ষ।

এই বাণী আজ ভারতের সীমা অতিক্রম করিয়া দূর-দূরান্তে চলিয়াছে। এ বাণীকে জন্মদান করিতেও পারিত কেবল ভারতবর্ষ। এই বাণী ভারতের মহিমা এবং ভারতের ত্যাগকে পুণ্যময় করিয়া তুলিতেছে। কে জানে, ইহাই হয়তো তাহার ক্রুশে পরিণত হইবে।

এ যেন মনে হয়, পৃথিবীকে এক নূতন জীবন প্রদানের জন্য একটি জাতিকে বলি দেওয়া। ইহুদিরাও তাহাদের মেশাইয়ার নিকট বলিপ্রদত্ত হইয়াছিল। এই মেশাইয়াকে তাহারা তাহাদের ধারণায় বহু শতাব্দী ধরিয়া ধারণ করিয়া আসিয়াছিল। কিন্তু তিনি অবশেষে সত্যই যখন একদিন রক্ত-কলংকিত ক্রুশে বিকশিত হইয়া উঠিলেন, সেদিন তাঁহাকে তাঁহারা চিনিতে পারিল না। সৌভাগ্যের বিষয় যে, ভারত তাহার মেশাইয়াকে (ত্রাণকর্তাকে) চিনিতে পারিয়াছে এবং নিজেদিগকে প্রমুক্ত করিবার জন্য আত্মবলি দিতে প্রফুল্ল চিত্তে চলিয়াছে।

কিন্তু, তাঁহারা সকলে প্রথম যুগের খ্রীষ্টানদের মতো তাঁহাদের মুক্তির বাস্তবিক অর্থ বুঝিতে পারিতেছেন না। বহু বৎসর ধরিয়া খ্রীষ্টানরা সুবর্ণ যুগ আসিবার অঙ্গীকার পূরণের জন্য প্রতীক্ষা করিয়াছিলেন। ভারতে এমন অনেকে আছেন, যাঁহাদের দৃষ্টি স্বরাজের গন্ডী ছাড়াইয়া দূরে যায় না। যাহাই হউক, আমার মনে হয়, ভারতীয়রা তাঁহাদের রাজনীতিক লক্ষ্যে সত্বর পৌঁছিতে পারিবেন।

যুদ্ধে বিপ্লবে রক্তাক্ত ক্লান্ত ইউরোপ আজ এশিয়ার চোখে আপনার অধিকার হারাইয়াছে—যে এশিয়াকে সে একদিন শাসন করিয়াছে, দমন করিয়াছে, আজ সেই এশিয়ার মাটিতে ইসলাম, ভারত, চীন ও জাপানের জাগ্রত জনসাধারণ যে আশা-আকাঙ্ক্ষা পোষণ করিতেছে, ইউরোপ দীর্ঘকাল তাহাকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারিবে না। কিন্তু মানবিক ঐকতানে দুই একটি নূতন জাতি কি নূতন সুরের সম্পদ আনিল, কেবল তাহাতেই কিছু আসে যায় না। তাহাতে কিছুই আসিবে যাইবে না, যদি এই জাগ্রত মনোবল সমগ্র মানবতার জন্য এক জীবন ও মৃত্যুর, এক কর্মের অভিনব আদর্শের বাহক হইতে না পারে, যদি না পারে অবসন্ন, পঙ্গু ইউরোপের জন্য

আনিতে নূতন পাথেয়, নূতন শক্তি।

হিংসার ঝঞ্ঝায় বিধ্বস্ত পৃথিবী। যে ঝটিকায় আমাদের সভ্যতার ফসল লাঞ্ছিত হইল, তাহা মেঘ-নির্মল আকাশ হইতে অকস্মাৎ ফাটিয়া পড়ে নাই। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া নিষ্করুণ জাতি-দর্প বিপ্লবের পৌত্তলিক আদর্শে প্ররোচিত হইয়া গঠনতন্ত্রের ফাঁকা বুলি পৃথিবীময় ছড়াইয়া দিয়াছে। এবং সর্বোপরি আসিয়াছে শ্রমশিল্পের, লুব্ধ অর্থগৃধ্নুতার এই শতাব্দী। অর্থনীতির বস্তুবাদী ব্যবস্থা, যাহার মধ্যে মানবাত্মার কণ্ঠরোধ ঘটিয়াছে, তাহা বিভীষিকাময় সংগ্রামের পরিণতি লাভ করিতে বাধ্য। এই সংগ্রামের ফলেই পাশ্চাত্যের সকল সম্পদ আজ বিলুপ্ত হইয়াছে। কিন্তু ইহা অনিবার্য, একথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে না। ইহার মধ্যে একটি মিথ্যানীতি, যাহার নামে মানুষ মানুষকে খুন করিতেছে—যে নীতির অন্তরালে একই লালসা একই হত্যার প্রবৃত্তি গোপন রহিয়াছে। কি জাতীয়তাবাদী, কি ফ্যাসিবাদী, কি বলশেভিক, তাহারা উৎপীড়িত হউক, কিংবা উৎপীড়ক হউক, সকলেই নিজেরা বলপ্রয়োগের দাবি করিতেছে, অথচ অপরে সেই দাবি করিলে তাহা মানিতেছে না। অর্ধ শতাব্দী পূর্বে যুক্তির অপেক্ষা শক্তিই ছিল প্রবল। আজ সে অবস্থার আরো অবনতি ঘটিয়াছে। শক্তিই হইয়াছে যুক্তি। শক্তি যুক্তিকে গ্রাস করিয়াছে।

এই ধ্বংসমান পুরাতন পৃথিবীতে আজ আশ্রয় নাই, মহান্ আলোক নাই গির্জাগুলি নিরাপদ উপদেশ দিয়াই খালাস, মাপ-করা ধর্মের উপদেশ, সতর্ক শব্দ দিয়া তৈয়ারী উপদেশ, তাহাতে শক্তির সহিত সংঘর্ষ বাধে না। তাহা ছাড়া গির্জা কেবল উপদেশ দেয়, উদাহরণ দেয় না। দুর্বল শান্তিবাদীরা চেঁচায়, কাঁদে। স্পষ্টই অনুভব করা যায়, তাহারা ইতস্তত করিতেছে, হাতড়াইতেছে, তাহারা এমন একটি আদর্শের কথা বলিতেছে, যাহাতে তাহাদের আর বিশ্বাস নাই। এই আদর্শকে, বিশ্বাসকে সত্য প্রতিপন্ন করিবে কে? এবং করিবে—এই অবিশ্বাসীর জগতে? বিশ্বাসকে প্রমাণ করিতে হইবে কর্মের দ্বারা।

ইহাই হইল পৃথিবীর নিকট সেই মহাবাণী, গান্ধীজী যাহাকে বলিয়াছেন, ভারতের বাণী—আত্মত্যাগ।

রবীন্দ্রনাথও এই প্রেরণালব্ধ বাণীরই পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন। কারণ, এই গৌরবময় নীতি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ এবং গান্ধী উভয়েই একমত :

"আমি আশা করি, এই ত্যাগের মনোভাব বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে, এবং সেই সঙ্গে সহনের অভীপ্সাও।...ইহাই সত্যিকারের স্বাধীনতা। ইহার অপেক্ষা উচ্চতর কিছুই নাই, এমন কি জাতির মুক্তিও না। বলপ্রয়োগে এবং বস্তুসম্পদে পাশ্চাত্যের অবিচল বিশ্বাস; সুতরাং পশ্চিম শান্তি এবং নিরস্ত্রীকরণের জন্য যতোই চীৎকার করুক না কেন, ইহার নৃশংসতা আরো উচ্চতর কণ্ঠে হাঁকিবে...যে সত্য নিরস্ত্রীকরণকে কেবলমাত্র সম্ভব করিবে না, তাহাকে শক্তিতেও পরিণত করিবে, সেই সত্য যে কী, তাহা আমরা ভারতীয়রাই, জগৎকে দেখাইব। পশু-শক্তির অপেক্ষা মানসিক শক্তি যে প্রবলতর, তাহা অস্ত্রহীন মানুষরাই প্রমাণ করিবে। জীবনের উদ্‌বর্তন

হইতে ইহাই দেখা গিয়াছে। জীবন একে একে তাহার খোসা ও খোলসের কঠিন দুর্ভেদ্য বর্ম, অস্ত্রসজ্জা এবং ভয়াবহ পরিমাণ মাংসের বোঝা বর্জন করিয়াছে এবং এইরূপে সৃষ্টি হইয়াছে এক পশু-শক্তি-জয়ী মানুষের। এমন দিন আসিবে, যেদিন দুর্বল, সৎ, সম্পূর্ণ নিরস্ত্র মানুষ প্রমাণ করিবে যে, অবনতরাই পৃথিবীর ভাবী অধিকারী। ইহাই যুক্তিযুক্ত যে, মহাত্মা গান্ধী, যিনি শরীরে দুর্বল, বস্তু-সম্পদে অসহায়, তিনিই প্রমাণ করিলেন যে, ভারতের নির্বিত্ত নির্যাতিত মানুষের অন্তরে অবনত বিনতের অজেয় শক্তি গোপন রহিয়াছে। ভারতের ভাগ্য-বিধাতা নারায়ণী সেনা নহে, নারায়ণ, দেহের শক্তি নহে, আত্মার। মানুষের ইতিহাসকে অবশ্যই উহা ঊর্ধ্ব-লোকে বহিয়া আনিবে। আনিবে বস্তুবাদী সংগ্রামের জটিল দুর্গম উপত্যকা হইতে মানস-দ্বন্দ্বের ঊর্ধ্ব অধিত্যকায়। যদিও আমরা পশ্চিমী অভিধান হইতে প্রাপ্ত শব্দের মালায় নিজেদিগকে প্রতারিত করি, তথাপি স্বরাজ ও স্বায়ত্তশাসন আমাদের বাস্তবিক লক্ষ্য নহে। আমাদের যুদ্ধ আত্মার যুদ্ধ, সমগ্র মানবতার জন্য। মানুষ তাহার চারিদিকে যে বন্ধন-জাল বুনিয়াছে, তাহা হইতে আমরা তাহাকে মুক্ত করিব। আমরা তাহাকে মুক্ত করিব জাতীয় স্বার্থপর প্রতিষ্ঠানগুলির ব্যূহ হইতে। আমরা প্রজাপতিকে বুঝাইব যে, আকাশের অনিবার উদারতা গুটিকার আশ্রয়ের অপেক্ষা সুন্দরতর। ভারতে 'নেশন' শব্দের কোনো প্রতিশব্দ নাই। আমরা যখন এই শব্দটি অপরের নিকট হইতে ধার করি, তখন ইহা আমাদের সহিত খাপ খায় না। কারণ, পরমপুরুষ নারায়ণের সহিতই আমাদিগকে মৈত্রী স্থাপন করিতে হইবে, এবং আমাদের জয় করিতে হইবে ভগবানের পৃথিবীকে।...আমরা যদি সমগ্র পৃথিবীকে অমর আত্মার শক্তি দেখাইয়া সবলকে, সমুন্নতকে, সশস্ত্রকে তুচ্ছ করিতে পারি, তবে দানব-কামনার এই বিশাল প্রাসাদ শূন্যে বিলীন হইয়া যাইবে। তখনই মানুষ লাভ করিবে তাহার সত্যকারের স্বরাজ। আমাদিগকেই, প্রাচ্যের এই হতভাগ্য সমাজচ্যুতের দলকেই, সমগ্র মানবের মুক্তি জয় করিতে হইবে।"......

গান্ধীজী বলিয়াছেন, "সমগ্র বিশ্বের সহিত বন্ধুত্বই আমাদের লক্ষ্য। মানুষের কাছে অহিংসা আসিয়াছে, থাকিবেও। ইহাই পৃথিবীতে শান্তির ঘোষণা।"

পৃথিবীর শান্তি এখনো সুদূরপরাহত। সে সম্বন্ধে আমরা কোনো প্রকার ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করি না। গত অর্ধ-শতাব্দী ধরিয়া আমরা মানুষের কাপট্য, ভীরুতা এবং নৃশংসতা প্রচুর পরিমাণে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। কিন্তু ইহা আমাদিগকে মানুষকে ভালোবাসিতে বিরত করিবে না। কারণ, এমন কি নিকৃষ্টতমের মধ্যেও এক দুর্বোধ্য দেবতাত্মা রহিয়াছেন। বিংশ শতাব্দীর ইউরোপ কিরূপ বস্তুতান্ত্রিক বন্ধনে বন্দী হইয়াছে, কিরূপ পূর্বপরিকল্পিত কঠিন অর্থনীতিক গন্ডীর মধ্যে অবরুদ্ধ হইয়াছে, তাহা আমরা জানি। আমরা বহু শতাব্দী ধরিয়া জানি, অসংখ্য বাসনা এবং নিয়মিত ভ্রান্তির ফলে আমাদের আত্মার চারিদিকে কঠিন এক আবরণের সৃষ্টি হইয়াছে, যাহা ভেদ করিয়া আলোকের প্রবেশ অসম্ভব। কিন্তু মানবের আত্মা যে কি অপ্রত্যাশিত অসম্ভবকেও প্রত্যক্ষ সম্ভব করিতে পারে, তাহাও আমরা জানি।

প্রাচীন কালে আমাদের অপেক্ষা কৃষ্ণতর আকাশকেও মানবাত্মার মহিমা কেমন

করিয়া উদ্ভাসিত করিয়াছিল, তাহা আমরা ইতিহাসে লক্ষ্য করিয়াছি। ক্ষণজীবী আমরা। আমরা ভারতের শিবের ডম্বরুর ধ্বনি শুনিয়াছি। সেই নটরাজরূপী শিব, যিনি নর্তন-অঞ্চলে তাঁহার প্রলয়ের দৃষ্টিকে গোপন করিয়া নৃত্যের সতর্ক পদক্ষেপে ধ্বংসের করাল কবল হইতে বিশ্বকে রক্ষা করেন।[৭৬] হিংসার রাজনীতিক যাঁহারা, তাঁহারা, কি বিপ্লবী, কি প্রতিক্রিয়াশীল যাহাই হউন না কেন, আমাদের আদর্শকে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করেন এবং তদ্দ্বারা তাঁহারা প্রকাশ করেন বাস্তব সম্পর্কে তাঁহাদের গভীর অজ্ঞতা। করুন তাঁহারা বিদ্রূপ। এই আদর্শই আমার। এই আদর্শ ইউরোপে ঘৃণিত লাঞ্ছিত হইয়াছে, তাহা আমি জানি। আমি জানি, যাঁহারা এই আদর্শে বিশ্বাসী, তাঁহাদের সংখ্যা আমার স্বদেশে মুষ্টিমেয় মাত্র—হয়তো এমনকি, মুষ্টিমেয়ও নহে। কিন্তু এই আদর্শে বিশ্বাসী যদি আমি একক মাত্রও হই, তাহাতেই বা ক্ষতি কি? বিশ্বাসের সত্যকারের স্বরূপ হইল পৃথিবীর প্রতিবাদকে অস্বীকার করা নহে, আদর্শকে স্বীকার করা, পৃথিবীর প্রতিবাদ সত্ত্বেও আদর্শে বিশ্বাসী হওয়া। আদর্শে বিশ্বাস এক প্রকার সংগ্রাম। এবং সর্বাপেক্ষা কঠিনতম সংগ্রাম হইল আমাদের এই অহিংসা। দৌর্বল্যের মধ্য দিয়া শান্তি আসিবে না। হউক শুভ, কিংবা অশুভ, সবল না হইলে তাহার কোনো মূল্য নাই। নিবীর্য শুভের অপেক্ষা বীর্যবান অশুভও শ্রেয়। ক্রন্দনাতুর শান্তিবাদ শান্তির মৃত্যুর ঘণ্টাধ্বনি মাত্র; ইহা ভীরুতা, ইহা অবিশ্বাস। যাঁহারা বিশ্বাস করেন না, যাঁহারা ভয় করেন, তাঁহারা অপসৃত হউন! আত্মত্যাগের মধ্য দিয়াই শান্তি আসিবে।

ইহাই গান্ধীজীর বাণী। ইহাতে যাহা নাই, তাহা কেবল মাত্র ক্রুশ। প্রত্যেকেই ইহা জানেন যে, ইহুদিদের জন্য না হইলে রোম কখনো যীশুকে ক্রুশবিদ্ধ করিত না। কিন্তু প্রাচ্যের জনমানবের আত্মা, তাহার সূক্ষ্মতম গভীরতম অংশ পর্যন্ত আজ আবেগে পাগল হইয়া উঠিয়াছে। তাহার সে স্পন্দন আজ আমরা সমগ্র পৃথিবীময় অনুভব করিতেছি।

প্রাচ্যে যে সকল ধার্মিক মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছে, তাঁহাদের সকলের আবির্ভাবের পিছনে রহিয়াছে একটি ছন্দোবদ্ধতা। একটি বিষয় সুনিশ্চিত যে, হয় গান্ধীজীর আত্মা জয়ী হইবে, নয় ইহার ঘটিবে পুনরাবির্ভাব, বহু শতাব্দী পূর্বে যেমনটি ঘটিয়াছিল বুদ্ধের ও খ্রীষ্টের মধ্যে। যতোক্ষণ পর্যন্ত না একটি নশ্বর অর্ধবিধাতার মধ্যে জীবনের এই নীতি, যাহা সমগ্র মানবতাকে এক নূতন পথে সঞ্চালিত করিবে, মূর্তিগ্রহ করিয়া উঠে, ততোদিন এই আবির্ভাবের ধারা বহিতেই থাকিবে এবং বহিবে, অবিরাম, অক্লান্ত।

---

৭৬ বিশাখদত্তের মুদ্রারাক্ষস নাটক (৪০০) হইতে প্রাচীন শিবস্তোত্রের একাংশ।

মহাত্মা গান্ধী

প্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক ১৬·০০

বাঙলা জীবনীসাহিত্যে গান্ধী শতবার্ষিকী বৎসরে একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন এই গ্রন্থটি তিনটি কারণে অনন্য। প্রথমত, লেখকের রাজনৈতিক দৃষ্টির স্বচ্ছতা ও স্বাধীনতা আন্দোলনের অভিজ্ঞতা গান্ধীর ঐতিহাসিক ভূমিকাকে কোথাও অহেতুক জটিলতা বা মতবিতর্কের মধ্যে নিয়ে যায়নি। দ্বিতীয়ত, তথ্য সংগ্রহ ও বিন্যাসে নির্ভুলতা এই গ্রন্থের সেরা সম্পদ। তৃতীয়ত, ঝরঝরে ভাষায় গ্রন্থটি জীবনীমাত্র নয়, জীবনীসাহিত্য হয়ে উঠেছে। এটি শুধু জীবনী নয়, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের অর্ধশতাব্দী কালের ঐতিহাসিক দলিলও।

গান্ধী চরিত

ঋষি দাস ৮·০০

প্রখ্যাত চরিতকার ঋষি দাস শেক্‌স্‌পিয়রের জীবনী লিখে যে খ্যাতির অধিকারী হয়েছেন, গান্ধী চরিতে তা আরও পূর্ণতা লাভ করল। শুধু তথ্যপঞ্জী নয়, সেই সঙ্গে স্বচ্ছ বুদ্ধি ও মুক্ত দৃষ্টিতে মহামানবের অবদানের বিশ্লেষণ, সতর্ক মন্তব্য, সরল ব্যাখ্যান, গভীর উপলব্ধিপ্রসূত বিচার এটিকে সর্বশ্রেণীর পাঠকের কাছে সমাদরণীয় করেছে। তৃতীয় সংস্করণ।

নোয়াখালিতে মহাত্মা

সুকুমার রায় ৮·০০

হিন্দুমুসলমানের সম্প্রীতিরক্ষার জন্য উৎসর্গিতপ্রাণ মহাত্মা গান্ধী স্বাধীনতার প্রাক্‌কালে নোয়াখালিতে সংঘটিত ভয়ংকর ভ্রাতৃঘাতী সাম্প্রদায়িক বর্বরতার মধ্যে মানবতার মহান আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে দিনের পর দিন পদব্রজে গ্রামের পর গ্রাম পরিক্রমণ করেছিলেন। আশাহত লাঞ্ছিত মানুষের বুকে ফিরিয়ে এনেছিলেন জীবনের সুস্থ বিশ্বাস, প্রীতি ও ভ্রাতৃদ্রোহিতার লজ্জা। একালের আর কোন মানুষের পক্ষে এমন বিস্ময়কর কীর্তি আজও সম্ভব হয়নি। সেই ঐতিহাসিক ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ। অধ্যাপক নির্মলকুমার বসুর গ্রন্থপরিচিতি ও বাপুজীর আশীর্বাণী সহ শতবার্ষিকী সংস্করণ।

গান্ধী ও মার্কস

কিশোরলাল মশরুওয়ালা ৫·০০

একালের সভ্যতা যে দুই মহামানবের চিন্তা আদর্শ ও মতবাদের দ্বারা সর্বাধিক প্রভাবিত হয়েছে, তাঁদের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা এই প্রথম। মার্কসবাদ ও গান্ধীবাদ দুই ভিন্নমুখী দর্শন, কিন্তু মানবকল্যাণই তার ভিত্তি। অথচ বিকৃত ব্যাখ্যায় দুই মতবাদ অনেকখানি দূরে সরে গেছে ও সাধারণের কাছে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছে। মশরুওয়ালা গান্ধীবাদের একনিষ্ঠ সেবক হয়েও স্বচ্ছ চিন্তা ও নৈয়ায়িক বুদ্ধিতে এই দুই মনীষীর জীবনাদর্শের যে বিচার করেছেন, তা মনকে সংস্কারমুক্ত করবে। শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রাঞ্জল অনুবাদ। দ্বিতীয় সংস্করণ।

গান্ধীজী

অনাথনাথ বসু ২·৫০

মোট পঁয়ত্রিশটি অধ্যায়ে গান্ধীজীর জীবনী ও বাণীকে সহজ সরল ভাষায় ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের কাছে তুলে ধরা হয়েছে। শিক্ষাবিদ লেখকের এই আদর্শ গান্ধীজীবনীটির অষ্টম সংস্করণই এর জনপ্রিয়তার প্রমাণ।

অহিংস বিপ্লব

আচার্য জে. বি. কৃপালনী ২·০০

গান্ধীবাদী রাজনীতিক ও সমাজবাদী আচার্য কৃপালনীর সুবিখ্যাত নন-ভায়োলেণ্ট রেভোলিউশান গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ—উনিশটি অধ্যায়ে সরল ভাষায় গান্ধীবাদের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যা।

মহাত্মা গান্ধী

রোমাঁ রোঁলা ৩·০০

রামকৃষ্ণ, রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ ও গান্ধীর জীবনদর্শনে আগ্রহী ভারতপ্রেমিক এই ফরাসী দার্শনিকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চরিতসাহিত্য 'মহাত্মা গান্ধী'। অহিংস শব্দের সঙ্গে সভ্যতার ইতিহাসে পাঁচটি নাম যুক্ত, বুদ্ধ খৃস্ট টলস্টয় রোঁলা ও গান্ধী। সুতরাং পৃথিবীর একই যুগের একজন অহিংসার ঋষির দৃষ্টিতে অপর ঋষির বিচার এই গ্রন্থের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। চতুর্থ প্রকাশ।